বোধিচর্যাবতার অনুসারে প্রজ্ঞার স্বরূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে এম. ফিল. উপাধি প্রাপ্তির আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত

রিয়াঙ্কা দত্ত

ক্রমিক সংখ্যা - MPPH194005
রেজিস্ট্রেশন নং - 133317 of 2015-16

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

মে, ২০১৯

Certified that the thesis entitled, বোধিচর্যাবতার অনুসারে প্রজ্ঞার স্বরূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ , submitted by me towards the partial fulfilment of the degree of Master of Philosophy (Arts) in Department of Philosophy of Jadavpur University , is based upon my own original work and there is no plagiarism . This is also to certify that the work has not been submitted by me for the award of any other degree / diploma of the same Institution where the work is carried out , or to any other Institution . A paper out of this dissertation has also been presented by me at a seminar / conference at one day state level seminar , titled **Philosophy : Then and Now ,** thereby fulfilling the criterion for submission , as per the M.Phil Regulation (2017) of Jadavpur University .

Riyanka Dutta.

RIYANKA DUTTA.

Roll No. : MPPH194005.

Registration No. : 133317 of 2015-16.

On the basis of academic merit and satisfying all the criteria as declared above , the dissertation work of Riyanka Dutta , entitled বোধিচর্যাবতার অনুসারে প্রজ্ঞার স্বরূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ , is now ready for submission towards the partial fulfilment of the Degree of Master of Philosophy (Arts) in Depatment of Philosophy of Jadavpur University.

P. Sarkar 13/05/19

Head

Department of Philosophy

Head
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Madhumita Chattopadhyay

Supervisor &

Convenor of RAC

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Maitreyee Datta

Member of RAC

Associate Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Scanned by CamScanner

-: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :-

আমার নিবন্ধ পত্রের মূল আলোচ্য বিষয় ''বোধিচর্যাবতার অনুসারে প্রজ্ঞার স্বরূপ ও শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ''। এই নিবন্ধ পত্রের সম্পূর্ণ আলোচনা আমি এক বছরের পরিসরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে থেকে সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছি। তিনি তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে আমার বিষয় সম্বন্ধে আমাকে অতি যত্ন সহকারে পড়িয়েছেন ও বুঝিয়েছেন। কিভাবে নিজেকে তৈরী করলে আমি আমার লক্ষ্যে উপনীত হব, সেই বিষয়েও উনি পরামর্শ দিয়ে আমাকে এই প্রবন্ধ সম্পূর্ণতায় সহায়তা করেছেন। তাই তাঁর প্রতি আমি আমার সবিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এর সঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই, তাঁরা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন। এছাড়া আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গ্রন্থকারিক শ্রী বিদ্যুৎ বিহারী সরকার এবং শ্রীমতী কাকলি পাল -কে ধন্যবাদ জানাই। তাদের সহযোগিতায় গ্রন্থগারের পুস্তকসমূহ পড়ার সুযোগ পেয়েছি। একইভাবে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্ কালচার প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থাগারের বিভিন্ন পুস্তক সংগ্রহের মাধ্যমে পড়ার সুযোগ পেয়েছি।

আমি বিশেষভাবে ঋণী আমার পিতা শ্রীযুক্ত উত্তম দত্ত এবং মাতা শ্রীমতী শুক্লা দত্তের কাছে। তাঁরা আমাকে এই কাজ সযত্নে সম্পন্ন করতে নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করেছেন। আমার দিদি শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা দত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দিদিরা এবং বন্ধুরাও আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। তাদের সহায়তা ব্যতীত আমি এম. ফিলের কাজ সযত্নে সম্পন্ন করতে পারতাম না। তাই সকলের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ ও তাদের ধন্যবাদ জানাই।

রিয়াঙ্কা দত্ত

তারিখ : ১৩ . ৫ . ২০১৯

-:সূচীপত্র :-

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-১২
প্রথম অধ্যায় - শান্তিদেব রচিত বোধিচর্যাবতার ও পঞ্জিকার নবম অধ্যায়ের প্রথম দুটি শ্লোকের মূল সংস্কৃত	১৩-২৮
দ্বিতীয় অধ্যায় - পারমিতার স্বরূপ অন্বেষণ	২৯-৪১
তৃতীয় অধ্যায় - প্রজ্ঞার স্বরূপ	৪২-৪৫
চতুর্থ অধ্যায় - সংবৃতি সত্য ও পারমার্থিক সত্যের পার্থক্য নির্দেশ	৪৬-৫৬
উপসংহার	৫৭-৬৭
গ্রন্থপঞ্জী	৬৮-৭২

-: ভূমিকা :-

ভারতীয় দর্শনে একটি অন্যতম সম্প্রদায় হল বৌদ্ধ দর্শন সম্প্রদায়। বৌদ্ধ দর্শনের আবির্ভাব ঘটে মহামুনি গৌতম বুদ্ধের চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্র করে, যার উল্লেখ বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। প্রথম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতে মহাযান বৌদ্ধদর্শনের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মহাযান সূত্র যেমন - *প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র , বিমলকীর্তিসূত্রনির্দেশ , সদ্ধর্মপুন্ডরিকসূত্র , দশভূমিকাসূত্র* এবং *সুখাবতীব্যূহসূত্রের* মধ্য দিয়ে এই মহাযান দর্শনের ক্রমবর্ধমান প্রসার ভারতে ও ভারতের বাইরে লক্ষ্য করা যায়।

যে মূল ধারণাটি মহাযান দর্শন ভাবনাকে হীনযান দর্শন ভাবনা থেকে পৃথক করেছে, তা হল - বোধিসত্ত্বের ধারণা। 'বোধিসত্ত্ব' শব্দের অর্থ বোধিলাভে আগ্রহী বৌদ্ধ ভিক্ষু। হীনযান দার্শনিকদের কাছে বোধিসত্ত্বের অর্থ হল - বোধিপ্রাপ্তির পূর্বে গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী জীবন পর্যায়। কিন্তু মহাযানীদের কাছে বোধিসত্ত্ব হলেন একজন আদর্শ পুরুষ, যিনি পরহিতে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন এবং নিজের জন্য তিনি কোনো কিছুই কামনা করেন না। এমনকী নিজের মুক্তিও নয়।

মহাযান বৌদ্ধদের বোধিসত্ত্বের এই ধারণা হীনযান বৌদ্ধদের শ্রাবক ও প্রত্যেকবুদ্ধের অর্থের সাথে বৈষম্য প্রদর্শন করে। 'শ্রাবক' শব্দের অর্থ বুদ্ধের শিষ্য, কিন্তু বুদ্ধের মৃত্যুর পর শ্রাবক বলতে বৌদ্ধমঠে যে সকল বৌদ্ধভিক্ষু একসাথে নিজস্ব মানসিক অনুশীলন ও সংযত জীবনযাত্রা পালনে রত থাকেন তাদের নির্দেশ করে। অপরদিকে, প্রত্যেকবুদ্ধ হলেন সেই সকল ভিক্ষু যারা নির্দিষ্ট সময়ে বৌদ্ধমঠে উপনীত হন এবং বেশিরভাগ সময়ে তারা দেশের বাইরে পরিভ্রমণ করেন, মানসিক সংযম অনুশীলনে রত থাকেন এবং একাকী নির্বাণ লাভে রত থাকেন।

প্রত্যেকবুদ্ধ নিজের মৃত্যুর সময়েও অন্য ভিক্ষুককে তার সেই বুদ্ধত্ব বা বোধি (enlightenment) প্রদান করেন না।

শ্রাবক এবং প্রত্যেক বুদ্ধ উভয়েই সমাজে নিজের পরিবারবর্গের মায়া ত্যাগ করে কঠোর সংযম অনুশীলনে রত থাকেন এবং এই অর্থে তাদের সমাজ বর্হিভূত বা অসামাজিক মানুষ বলা হয়। শ্রাবক ও প্রত্যেক বুদ্ধের লক্ষ্য বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি নয়, বরং বুদ্ধত্বের পূর্বে অর্হৎত্ব প্রাপ্তি। উল্লেখ্য, হীনযানী সম্প্রদায়ের শ্রাবক ও প্রত্যেকবুদ্ধের এই কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনতার জীবন মহাযান সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার সাথে এক নয়।

বিপরীতে বোধিসত্ত্ব বেশিরভাগ সময়েই একজন সংসারভুক্ত মানুষ যিনি তার গোষ্ঠীর লোকের সকলেরই শ্রদ্ধা এবং সম্মানের পাত্র। তিনিই সমস্ত ব্যক্তিকে নৈতিক পথে চলার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এমনকী যখন বোধিসত্ত্ব ভিক্ষু হন তখনও তিনি জনসাধারণকে পরিত্যাগ না করে সাধারণ মানুষের প্রতিভূ হয়ে থাকেন। তাঁর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ছয়টি পারমিতা যথা - দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা প্রকাশ ঘটে। পারমিতাগুলির প্রত্যেকটির প্রয়োজনীয়তা অপরের জন্য এবং এগুলির মধ্য দিয়ে বোধিসত্ত্ব তাঁর পরার্থপরতার মনোভাবটি ফুটিয়ে তোলেন। দৃষ্টান্তরূপে বলা যায়, দানশীলতা- এই পারমিতা হীনযানী বৌদ্ধদের কাছে সংঘের ভিক্ষাদানের মধ্যেই সীমিত ছিল। কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধদের মতে দানশীলতা বলতে বোঝায় অপরের জন্য বোধিসত্ত্বের সেই অনুশীলন যাতে তিনি অপরের জন্য সমস্ত কিছু এমনকী নিজের জীবন, নিজের কর্মফল - সবই উৎসর্গ করেন।

মহাযান সম্প্রদায়ের দার্শনিকদের একাংশের মতে বোধিসত্ত্ব হল সেই ব্যক্তি যিনি নিজের ব্যক্তিগত বোধি আকাঙ্ক্ষা করেন এবং সেই কারণেই এই বোধিসত্ত্বের ধারণা হীনযান শ্রাবকের ধারণা থেকে পৃথক নয়। তারা বরং বোধিসত্ত্বের ধারণার সঙ্গে মহাসত্ত্বের ধারণা যুক্ত করেন এইটা বোঝাতে যে, এই বোধিসত্ত্ব হল মহাপ্রাণ ব্যক্তি যিনি পরহিতের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

যেহেতু মহাসত্ত্ব অর্থাৎ ব্যক্তি যারা পরহিতে রত তাদের কথা বৌদ্ধদর্শনের বাইরেও পাওয়া যায়। তাই এই ধরনের মহাসত্ত্বকে বৌদ্ধদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বোধিসত্ত্ব বলা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে বোধিসত্ত্বের অর্থ হল মহাযান বৌদ্ধধর্মে রত ব্যক্তি যিনি নিজেকে নিজের এবং অপরের বোধির জন্য নিযুক্ত করেন। এই যে বোধি একেই বলা হয় প্রজ্ঞাপারমিতা । এটি হল শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। যা বুদ্ধের সর্বজ্ঞতা, নিছক অর্হৎ-এর সীমিত জ্ঞান নয়।

বৌদ্ধ পদ 'বোধিপ্রাপ্তি'র বিভিন্ন সমার্থক শব্দ রয়েছে যেমন - বোধি, অনুত্তর, সম্যক্ সম্বোধি, অভিসময়, অভিসম্বোধ ইত্যাদি। এখানে বোধিপ্রাপ্তির অর্থ 'সর্বজ্ঞতা'-র অর্থ দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে। এই পদের মধ্য দিয়ে বোধি শব্দের তিনটি প্রকারকে নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রথম প্রকারের যে বোধি তা হীনযান সন্ন্যাসী বিশেষ করে শ্রাবক এবং প্রত্যেকবুদ্ধের জ্ঞানকে বোঝায়। এ জ্ঞান বাস্তব জগতের বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান এবং তা সম্পূর্ণভাবে এই জগতের সমস্ত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে উপলব্ধি করার কথা বলে। এটি হল সেই জ্ঞান যার দ্বারা সৎ-কে অসৎ-এর থেকে পৃথক করা যায়। এই বোধিতে পুদ্গল নৈরাত্ম্যের বোধ হয় কিন্তু যে সমস্ত উপাদানের দ্বারা এই ব্যবহারিক জগৎ গঠিত হয় তার নৈরাত্ম্যের বোধ হয় না। সুতরাং এই বোধি অনেকটাই নিম্নস্তরের।

দ্বিতীয় প্রকার বোধিপ্রাপ্তির অর্থ হল বোধিসত্ত্ব যিনি পরবর্তীতে বুদ্ধ হবেন, এটি বোধিসত্ত্বের সকল পদ্ধতির অনুশীলনকে বোঝায় যা তাকে বুদ্ধের স্তরে উপনীত হতে সহায়তা করবে, তাকেও নির্দেশ করে। একেই বৌদ্ধ ভাষায় উপায়কৌশল্য (Skillfull means) বলে। উপায়কৌশল্য শব্দটি ব্যবহৃত হয় নিজের ও অপরের স্বার্থে বোধিসত্ত্বের সকল অনুশীলনকে বোঝাতে কিন্তু সে নিজে এই বিষয়ে জ্ঞাত যে, জগতে ব্যক্তিরূপে কোনো জীবাত্মা নেই (পুদ্গলনৈরাত্মা) এবং জগতে কোনো বস্তু বা ধর্মও নেই (ধর্মনৈরাত্ম্য)। উল্লেখ্য, বৌদ্ধদর্শনে ধর্ম শব্দটি বস্তু বা বিষয়কে নির্দেশ করে। তৃতীয়তঃ, বোধিপ্রাপ্তি বলতে বুদ্ধের অতুলনীয় জ্ঞানকে

নির্দেশ করে যা সকল বস্তুর শূন্যতার জ্ঞানকে বোঝায়। একেই প্রজ্ঞার অনুশীলন বা প্রজ্ঞাপারমিতা বলে। প্রকৃতপক্ষে প্রজ্ঞা পারমিতা বলতে বুদ্ধের সর্বজ্ঞানী মনোভাবকে নির্দেশ করে। আমার এই গবেষণাগ্রন্থে এই প্রজ্ঞারই স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই প্রজ্ঞার বর্ণনা বিভিন্ন মহাযানসূত্রে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। আমরা এখানে শান্তিদেব রচিত *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থটিই মুখ্যতঃ অনুসরণ করেছি। এই শান্তিদেব হলেন মহাযানী বৌদ্ধদার্শনিকগণের মধ্যে অন্যতম। বৌদ্ধাচার্য্য শান্তিদেবের দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল - *বোধিচর্যাবতার* এবং *শিক্ষাসমুচ্চয়* গ্রন্থ। *শিক্ষাসমুচ্চয়* গ্রন্থটি মহাযান তত্ত্ব বা নীতির সংক্ষিপ্তসার, যা ২৭ টি শ্লোকের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শ্লোক অনুযায়ী অধ্যায়গুলির নামাঙ্কিত করা হয়েছে। তাঁর এই সাতাশটি শ্লোকের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অপরদিকে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থটি হল কাব্যিক সাহিত্যের একটি অতি মার্জিত ও উজ্জীবিত অংশ, যার মধ্য দিয়ে ধার্মিক চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে এবং যা তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সুদৃঢ়তা এবং সূক্ষ্মতার পরিচয়ের দাবি রাখে।

তারানাথ এবং Bu-ston- এর মতানুযায়ী, *বোধিচর্যাবতার* শাস্ত্রের রচয়িতা ছিলেন সৌরাষ্ট্রের (বর্তমান গুজরাট) রাজা কল্যাণবর্মনের পুত্র। যিনি অষ্টম শতকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার পরবর্তী সুযোগ্য রাজা হিসাবে সম্মান পেলেও তাঁর স্বপ্নে মঞ্জুশ্রীর উপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সেই পথ অস্বীকার করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি নালন্দায় গিয়ে ভিক্ষু সংঘে যোগদান করেন। সেই থেকেই তিনি শান্তিদেব নামে পরিচিতি লাভ করেন।

বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের অন্তর্গত দশটি অধ্যায়ে কেবলমাত্র শ্লোকেই রচিত । তাঁর এই শ্লোকগুলির মধ্য দিয়ে বোধিচিত্তের এক উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া যায় এবং তা বোধিসত্ত্বের জীবনে প্রজ্ঞালাভের ক্ষেত্রে পারমিতার ক্রমিক অনুশীলনের পথেরও নির্দেশ দেয়। এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে লেখকের গ্রন্থটি রচনার মূল উদ্দেশ্যের পরিচয় পাই। বোধিসত্ত্বের জীবনের প্রকৃত যে লক্ষ্য- সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ, তারও পরিচয় পাই এই অধ্যায়ে।

শান্তিদেবের মূল উদ্দেশ্য হল - মহাযান সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ মাধ্যমিক দর্শনে যেভাবে জীবনের আদর্শকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেটিকে তুলে ধরা। গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে, বোধিসত্ত্বের দ্বারা প্রাপ্ত প্রজ্ঞার পরিচয় পাই। যেখানে যুক্তি-তর্কের বিশ্লেষণ নেই এবং মাধ্যমিক চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য প্রকাশে যে দুর্বোধ্য যুক্তি তুলে ধরা হয়, তার বিশ্লেষণেরও স্থান সেখানে নেই। বরং এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা এক ধার্মিক উদ্যমতা এবং আধ্যাত্মিক আন্তরিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করি। অভিধর্ম দর্শনে জাগতিক বস্তুর সত্তাবিষয়ক যে তত্ত্ব পাই তা প্রকৃতপক্ষে শুষ্ক, সেখানে আবেগের কোনো স্থান নেই। কিন্তু যে সকল সাধারণ ব্যক্তির কাছে ভক্তি, ভাবাবেগের প্রধান্য ছিল তাদের জন্য গ্রন্থটি অন্যরকমভাবে উপস্থাপন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, কারণ সেই সময়ে মানুষের ধর্মীয় আবেগ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সেই আবেগের ফলশ্রুতি হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মকায়ের ধারণা গড়ে উঠেছিল, একে প্রধান্য দিয়েই এই জাতীয় প্রজ্ঞাপারমিতা শাস্ত্রের সূচনা। যে আধিবিদ্যক তত্ত্বকে মাধ্যমিক দার্শনিক নাগার্জুন তাঁর যৌক্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে, কোনো প্রকার ধর্মীয় আবেগের স্থান সেখানে থাকতে পারে না। সেই ধর্মীয় আবেগকে শান্তিদেব তাঁর দর্শনে বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানেই এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা।

বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে, বোধিসত্ত্বের জীবন পথে বোধিচিত্তের সম্প্রসারণ (development) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা বুদ্ধত্ব লাভের পথে উৎসাহ প্রদান করে। এই অধ্যায়ে বোধিচিত্তের অগ্রগতির পথ বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। এই বোধিচিত্তই হল সমস্ত সুখের মূল উৎস এবং বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ভিত্তি। এর দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি লাভ সম্ভব। বোধিচিত্ত হল বোধিসত্ত্বের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্তর, যেমন একটি গাছের ফল প্রদানের পর তার কার্যক্ষমতা কিছুটা কমে যায়, কিন্তু বোধিসত্ত্বের জীবনে বোধিচিত্তের অগ্রগতি যেভাবে ফল প্রদান করে তার কখনো নিবৃত্তি ঘটে না, বরং তা সময়ান্তরে আরও উর্বর হয়। এই অধ্যায়ে শান্তিদেব দুই প্রকার বোধিচিত্তের মধ্যে পার্থক্য করেছেন - (১) বোধি প্রণিধি চিত্ত এবং (২) বোধি প্রস্থান চিত্ত। সর্ব জগতের পরিত্রাণের জন্য বোধিলাভের পথে অগ্রসর হওয়ার সংকল্প জাগ্রত

করাকে বোধি প্রণিধি চিত্ত বলে। অন্যদিকে, বোধিপ্রাপ্তির জন্য সক্রিয় উদ্যোগ বা প্রচেষ্টাকে বোধি প্রস্থান চিত্ত বলে। অর্থাৎ, বোধি প্রণিধি চিত্ত বোধিলাভের পথ দেখায় এবং মূল লক্ষ্য অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভের পথে এগিয়ে যাওয়াকে বোধি প্রস্থান চিত্ত বলে।

বোধিচিত্তের বোধ সম্পর্কে অবগত করতে গিয়ে শান্তিদেব কিছু পূর্ব শর্তের উল্লেখ করেন, যেমন - পাপদেশনা (the confession of sin)। এইভাবে তিনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, প্রথমতঃ ত্রিরত্নের অধিকারী হতে হবে, দ্বিতীয়তঃ, বোধিলাভের পথে অগ্রসর হতে হলে তার সমস্ত পাপের স্বীকারোক্তি করা প্রয়োজন। বৌদ্ধগ্রন্থের পূর্ব সূত্রেও এর উল্লেখ পাই। পাপের স্বীকারোক্তি একজনের ভবিষ্যতকে উন্নত করে তুলতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ে, বোধিচিত্ত পরিগ্রহ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আত্মত্যাগের ধারণা, যা বৌদ্ধদর্শনের জীবনযাত্রায় অতি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, তা তুলে ধরা হয়েছে। সাংসারিক বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভের উদ্দেশ্যে এবং সুখ প্রদানের ক্ষেত্রে এই আত্মত্যাগের ধারণায় মহাযান দার্শনিকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বোধিসত্ত্বের জীবন পথে বোধিচিত্তের উন্নতি বা অগ্রগতি ঘটানো একটি অন্যতম ব্রত।

পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে, বোধিচিত্ত প্রমাদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। একজন বোধিসত্ত্বের জীবনে বোধিলাভের পথে বোধিচিত্তের গ্রহণই পর্যাপ্ত নয়, যতক্ষণ না সে তার সমস্ত অলসতা অতিক্রম করে বোধিলাভের সকল নিয়ম কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পালন করতে পারবে। এমনকী এই অধ্যায়ে এই নিয়ম পালন থেকে বিরত হলে তার কুফল কী হতে পারে - সেই বিষয়েও বিশদ আকারে আলোচনা করা হয়েছে। এইরূপ ব্রত নিষ্ঠাভাবে পালন করলে বোধিসত্ত্বের জীবনে চরম উপলব্ধি সম্ভব।

পারমিতা অনুশীলন যথা - দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা ইত্যাদি অনুশীলনের ক্ষেত্রে যথাযথ দৃষ্টি বা সম্প্রজন্য (watchfulness)- এর গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে। যিনি চঞ্চল মনের অধিকারী বা যার চিন্তা-ভাবনা সংযত নয় তিনি এই ব্রত পালনে অক্ষম।

এরপর ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ক্ষান্তি পারমিতার আলোচনা করা হয়েছে। যা পরবর্তীকালে মহাযান দর্শনে এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এর উল্লেখ পাওয়া যায় আর্যসূরী-এর *জাতকমালা* গ্রন্থে।

সপ্তম অধ্যায়ে, বীর্যের গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বীর্যে দ্বারাই ক্ষান্তির অনুশীলন সম্ভব হয়, যা বোধিলাভে সহায়তা প্রদান করে। যে ব্যক্তি এখনও জাগতিক বস্তুর আবেগ থেকে মুক্ত হতে পারেননি তার নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা উচিত, যা বীর্যের অনুশীলনের মাধ্যমে সম্ভব হবে।

অষ্টম অধ্যায়ে, ধ্যান পারমিতা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং প্রজ্ঞা বা চরম জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত ক্ষান্তি ও বীর্যের অনুশীলন বোধিসত্ত্বের জীবনে মানসিক শুদ্ধতা (একাগ্রতা)-র পথ প্রশস্ত করে।

নবম অধ্যায়ে, প্রজ্ঞা পারমিতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মহাযান দর্শনে বিশেষতঃ মাধ্যমিকগণ এই প্রজ্ঞা পারমিতার ধারণার মধ্যে দিয়েই তাদের মূল তত্ত্ব শূন্যতা এবং বিমুক্তিমার্গের ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন। এর সাথে সাথে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের প্রথম অংশে ধার্মিকতা এবং ভক্তিরও ব্যাখ্যা রয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় নাগার্জুনের *মধ্যমকশাস্ত্রে*। সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্যের অজ্ঞানতা বোধিজ্ঞান লাভের পথে অন্তরায়। তাই বোধিলাভের পথে এবং বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই দুই প্রকার সত্যের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু মাধ্যমিকগণ নিজেদের এই দ্বৈত

সত্তা - সংবৃতি সত্তা ও পরমার্থ সত্তা-এর ব্যাখ্যার কবল থেকে মুক্ত রেখেছেন। সংবৃতি সত্য অনুযায়ী, বস্তু স্বরূপ সাধারণ জগতে যেভাবে প্রকাশিত হয়, বস্তু আসলে সেইরকমই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা ভ্রান্ত। এই ভ্রান্ততা পরিলক্ষিত হয় তখনই, যখন তাকে অতিজাগতিক দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করা হয়। অতি জাগতিক তথা বৌদ্ধ ভাষায় পরমার্থ সত্তা অসীম ও ধারণাতীত স্তর। পরমার্থতঃ সকল কিছুই ধারণার অতীত, যা বৌদ্ধ পরিভাষায় শূন্য। এই অধ্যায়ে শান্তিদেব বস্তুবাদ ও ভাববাদের প্রতি আঘাত হানেন। তিনি হীনযান দার্শনিক সম্প্রদায় বিশেষতঃ সর্বাস্তিবাদীদের অস্তিত্ববাদ তত্ত্বকে ভ্রম বলে সমালোচনা করেন। অপরদিকে, বিজ্ঞানবাদীদের তত্ত্ব, সকল জাগতিক বস্তু অনস্তিত্বশীল, একমাত্র জ্ঞান বা ধারণাই সত্য- এই তত্ত্বটিকেও ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন অ-বৌদ্ধ দার্শনিকদের তত্ত্বগুলিকেও সমালোচনা করেন। মাধ্যমিকগণের মতে, সত্তা হল ধারণাতীত, অতএব তা শূন্য। সবকিছুই যে প্রকৃতকক্ষে শূন্য-এর যথার্থ উপলব্ধিই হল প্রজ্ঞাপারমিতা। যা বোধিসত্ত্বকে সম্যক্ সম্বোধির স্তরে উন্নীত হতে সহায়তা করে।

শান্তিদেবের এই গ্রন্থে প্রথম থেকে অন্তিম অধ্যায় পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই নৈতিকতার একটি স্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হয়। যেখানে কেবলমাত্র একজন বোধিসত্ত্বের চারিত্রিক শুদ্ধতা, তার বোধিচিত্ত লাভ অথবা প্রজ্ঞাপারমিতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার পথকেই তুলে ধরেননি, তার সাথে সকল প্রাণীর উন্নতি সাধনের কথা চিন্তা করেছেন। এইভাবে এই পরিণমনা (principle of pariṇamanā) তত্ত্বেরও উল্লেখ করেন। যেখানে বলা হয়েছে, একজনের কর্ম শুধু তার নিজের জন্য নয়, অন্যের উপকারেও সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম। পূর্বেই বলা হয়েছে, শান্তিদেব এই গ্রন্থে মাধ্যমিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে বোধিসত্ত্বের জীবনযাত্রাকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা ও যুক্তি সঙ্গত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। তবে এ কথা সত্য যে, শান্তিদেবের পূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের আদর্শের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবুও শান্তিদেব এই গ্রন্থে বোধিসত্ত্বের ধারণাকে বিভিন্ন স্তরের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর প্রাঞ্জল ভাষার মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যা পরবর্তীকালে ভারতে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে গণ্য হয় এবং

শান্তিদেব-এর এই গ্রন্থের উপর বহু টীকাও রচিত হয়েছে। এই টীকাগুলির মধ্যে তিব্বতি সংস্করণের দশটি টীকা সংরক্ষিত রয়েছে, সেগুলি হল - (১) প্রজ্ঞাকরমতি রচিত the *dkaḥ ḥgrel* by Śes – rabḥbyuṅ-gnas , (২) the *Rnam-par bśad-paḥi dkaḥ-ḥgrel* , (৩) শুভদেব রচিত the *Legs-par sbyar-ba* by Dge-ba lha , (৪) কৃষ্ণপাদ-এর রচিত the *Rtogs-par dkaḥ-baḥi gnas gtan-la-bdaḥ-pa* , (৫) বৈরোচনরক্ষিত রচিত the *Dkaḥ-ḥgrel* , (৬) the *Śes-rab leḥuni dkaḥ-ḥgrel* , (৭) the *Śer-leḥi sṅo-baḥi dkaḥ-ḥgrel* , (৮) স্বর্ণদীপের লামা ধর্মকীর্তি রচিত the *Don Sumcu-rtsa-drug bsdus-pa* by Gser-gliṅ-gi bla-ma chosskyoṅ , (৯) লামা ধর্মকীর্তি রচিত the *Don bsdu-pa* , (১০) বিভূতিচন্দ্র রচিত the *Dgons-paḥi ḥgrel-pa khy ad-par gsal byed śes-bya-ba* ।

শান্তিদেব রচিত এই দশটি টীকার মধ্যে একটি অন্যতম হল প্রজ্ঞাকরমতি রচিত *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকাটীকা* , যা আমার আলোচনার মূল গ্রন্থ।

আচার্য শান্তিদেব রচিত *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের টীকাকার প্রজ্ঞাকরমতি বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছেন,

অলক্ষণমনুৎপাদমসংস্কৃতমবাংময়ং।
আকাশং বোধিচিত্তং চ বোধিরদ্বয়লক্ষণা ।। ইতি ।।[১]

তত্র সত্ত্বং । অভিপ্রায়হস্যেতি বোধিচিত্তঃ।

১। প্রজ্ঞাকরমতিকৃত *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা* , কলিকাতা , এশিয়াটিক সোস্যাইটি প্রকাশিত , ১৯১২ , পৃষ্ঠা -৪২১ ।

অর্থাৎ যার লক্ষণ দেওয়া যায় না, যার উৎপত্তি নেই, যা সংস্কৃত নয়, যা বাক্যের দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়, যার আকাশের মতো স্বরূপ, বোধির সাথে অদ্বয় লক্ষণযুক্ত তাকেই বোধিচিত্ত বলি। বোধিচিত্তের সত্ত্বা যার অভিপ্রায়, তিনিই বোধিসত্ত্ব। এই বোধিসত্ত্ব তিনিই হতে পারেন যার বুদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা আছে এবং যিনি নিজের পরম মুক্তি কামনা করেন না। বোধিসত্ত্বের স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য ব্যক্তির উচিত বোধিচিত্তকে জাগ্রত করা। স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরার্থে আত্মদানের যে সাধনা বা সংকল্প - সেই সাধনার যে প্রয়াস তাকে বোধিচিত্ত বলে। এই প্রসঙ্গে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে, যারা সংসারে অসংখ্য দুঃখ থেকে উদ্ধারলাভ করতে চান, যারা জীবনের দুঃখ-শোক দূর করতে চান তাদের ক্ষেত্রে বোধিচিত্ত জাগ্রত করা অপরিহার্য। বোধিচিত্ত উৎপাদন পূর্বক বোধি বা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য যে চর্যা বা বিশেষ সাধন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়, তাকেই বলে বোধিচর্যা।

এই বোধিসত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য ব্যক্তির জীবনশৈলী কেমন হবে এবং তার মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ কীভাবে বিকশিত হবে - এই নিয়ে বিভিন্ন মহাযান গ্রন্থে নানা রকম আলোচনা করা হয়েছে। তবে সকলেই এই বিষয়ে এক মত যে, বোধিসত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য ব্যক্তির মধ্যে প্রজ্ঞার অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। প্রজ্ঞা বৌদ্ধমতে একটি পারমিতা। এছাড়াও প্রজ্ঞা অতিরিক্ত আরও অনেক পারমিতা মহাযান গ্রন্থগুলিতে স্বীকৃত হয়েছে, যদিও পারমিতার সংখ্যা কী হবে - তা নিয়ে মহাযানী দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সমস্ত পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞাকেই শ্রেষ্ঠ রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

বৌদ্ধদর্শনে নির্বাণ লাভ করতে হলে বা বুদ্ধত্ব অর্জন করতে হলে তার উপায়স্বরূপ পারমিতার অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। বৌদ্ধদর্শনে দশটি পারমিতার উল্লেখ আছে। এই দশটি পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞা একটি অন্যতম পারমিতা। আমার এই সন্দর্ভের মূল লক্ষ্য হল, আচার্য শান্তিদেব রচিত *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থ অবলম্বন করে প্রজ্ঞাপারমিতার স্বরূপ নির্ধারণ করা

এবং সমস্ত পারমিতার মধ্যে কেন প্রজ্ঞাকে শ্রেষ্ঠ পারমিতারূপে গণ্য করা হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করা।

আমার এই সন্দর্ভকে মোটামুটি চারটি অধ্যায়ের অর্ন্তভুক্ত করেছি। এগুলি হল নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায়ে , প্রজ্ঞাকরমতির টীকাসহ শান্তিদেব রচিত *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদের প্রথম দুটি কারিকার মূল সংস্কৃত উপস্থাপনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে , পারমিতার স্বরূপ ও শ্রেণীবিভাগ অর্থাৎ প্রজ্ঞা ব্যতীত দান, শীল ইত্যাদি পাঁচটি পারমিতার পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ে , আচার্য শান্তিদেব রচিত *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থ অবলম্বনে প্রজ্ঞার স্বরূপ অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে , প্রজ্ঞার স্বরূপ প্রসঙ্গে দুই প্রকার সত্যের বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

এই অধ্যায়গুলির মধ্যে প্রজ্ঞার স্বরূপ নির্ধারণ এবং প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ - এই অধ্যায় দুটি আলোচিত হয়েছে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদ প্রজ্ঞাপারমিতা অবলম্বন করে এবং এই গ্রন্থের উপর রচিত প্রজ্ঞাকরমতির টীকা অবলম্বন করে। কিন্তু পারমিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং দান, শীলাদি পারমিতার পরিচয় দেওয়ার জন্য আমি *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের অংশ ছাড়াও *শিক্ষাসমুচ্চয়*-এর কিছু উদ্ধৃতি আলোচনা করেছি। যদিও অনেকাংশে এখানে সবসময়

মূলগ্রন্থ ছাড়াও সহকারী গ্রন্থেরও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। বোঝার সুবিধার জন্য আমরা আমাদের আলোচনার প্রারম্ভেই প্রজ্ঞাকরমতির টীকাসহ শান্তিদেব রচিত *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদের প্রথম দুটি কারিকা যা আমার এই গবেষণার বিষয়বস্তু তার মূল সংস্কৃত তুলে ধরেছি। তাই দিয়েই আমার গবেষণা গ্রন্থের শুরু।

আমার এই সন্দর্ভে আমি মূলত বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি অর্থাৎ শান্তিদেব তাঁর গ্রন্থে এবং প্রজ্ঞাকরমতি তাঁর টীকায় যা বলেছেন, তাকে অবলম্বন করে বিশ্লেষণ করেই আমি আমার গবেষণার কাজ করেছি।

-: প্রথম অধ্যায় :-

শান্তিদেব রচিত বোধিচর্যাবতার ও পঞ্জিকার নবম অধ্যায়ের প্রথম দুটি শ্লোকের টীকাসহ মূল সংস্কৃত

অথ যো নাম কশ্চিদ্‌গোত্রবিশেষাৎ পর্যুপাসিতকল্যাণমিত্রতয়া চিজগৎপর্যাপন্নসমস্তজনদুঃখদুঃখী সর্বপ্রাণভৃতাং নিঃশেষদুঃখসমুদ্ধরণশয়ঃ স্বসুখনিরপেক্ষঃ তৎপ্রশমোপায়ভূতং বুদ্ধত্বমেব মন্যমানস্তৎ-প্রাপ্তিবাঞ্ছয়া সমুৎপাদিতবোধিচিত্তো মহাত্মা সৌগতপদসাধনোপায়ভূতসংভারদ্বয়পরিপূরণার্থং ক্রমেণ দানাদিষু প্রবর্ততে। তস্য তথা প্রবর্তমানস্য সম্যক্‌ প্রতি[--]শমথস্যাপি দানাদয়ঃ প্রজ্ঞাবিকলতয়া জগদর্থসংপাদননিদানং বুদ্ধত্বং নাবহন্তীত্যভিসংধায়। অবশ্যং সংসারদুঃখনির্মোক্ষার্থিনা প্রজ্ঞোৎপাদনায় যতিতব্যং। যথোক্তং।

শমথেন বিপশ্যনাসুযুক্ত। ইত্যাদি।

তত্র শমথপ্রতিপাদনং কৃতমিদানীং তদনন্তরপ্রাপ্তাং বিপশ্যনাং প্রজ্ঞাপরনামধেয়াং প্রতিপাদযন্নাহ।

ইমং পরিকরং সর্বং প্রজ্ঞার্থ হি মুনির্জগৌ ।
তস্মাদুপাদয়েৎপ্রজ্ঞাং দুঃখনিবৃত্তিকাঙ্ক্ষয়া ।। ১ ।।

ইমমিতি সমনন্তরমিহ শাস্ত্রে লক্ষণতঃ প্রতিপাদিতং দানাদিকমিদন্তয়া প্রত্যক্ষতয়া পরামৃশতি। পরিকরমিতি পরিবারং পরিচ্ছেদং সংভারমিতি যাবৎ । সর্বমুক্তপ্রকারমন্যঞ্চ । প্রজ্ঞার্থং হি মুনির্জগাবিতি সংবন্ধঃ । প্রজ্ঞা যথাবস্থিতপ্রতীত্যসমুৎপন্নবস্তুতত্বপ্রবিচয়লক্ষণা সৈবার্থঃ প্রয়োজনং

সংবোধিহেতুভাবোপনাযকতয়া যস্য দানাদিলক্ষণস্য পরিকরস্য স তথা তমিতি । দানপারমিতাদিষু ধর্মপ্রবিচয়স্বভাবায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ প্রধানত্বাৎ ।

তথা হি দানং সংবুদ্ধবোধিপ্রাপ্তয়ে প্রথমং কারণং পুণ্যসংভারান্তর্ভূতত্বাৎ । তঞ্চ শীলালংকৃতমেব সুগতিপরংপরা।ং সুখ ভোগোপকরণসংপন্নামাবহদনুত্তরজ্ঞানপ্রতিলম্ভহেতুঃ । ক্ষান্তিরপি ত-দ্বিপক্ষভূতপ্রতিঘপ্রতিপক্ষতয়া দানশীলসুকৃতময়ং সংভারমনুপালয়ন্তী সুগতত্বাধিগতয়ে সংপ্রবর্ততে । এতঞ্চ শুভং দানাদিত্রিতয়সংভূতং পুণ্যসংভারাস্ব্যং ধ্যানাদিসমুপজনিতং চ জ্ঞানসংভারাস্ব্যং বীর্যমন্তরেণ ন ভবতীতি তদপ্যুভয়সংভারকারণতয়া সর্বাবরণপ্রহাণায় সমুপজায়তে । সমাহিতচিত্তস্য চ যথাভূতপরিজ্ঞানম্ উৎপদ্যত ইতি ধ্যানপারমিতাপ্যনুত্তরজ্ঞানহেতুরূপপদ্যতে ।

এবমেতে দানাদয়ঃ সৎকৃত্য সংভৃতা অপি প্রজ্ঞামন্তরেণ সৌগতপদাধিগমহেতবো ন ভবন্তীতি । নাপি পারমিতাব্যপদেশং লভন্তে । প্রজ্ঞাকৃতপরিশুদ্ধিভাজঃ পুনরব্যাহতোদারপ্রবৃত্তিতয়া তদনুকুল-মনুবর্তমানাস্তদ্ধেতুভাবমধিগচ্ছন্তি । পারমিতানামধেয়ং চ লভন্তে ।

তথা দাতৃদেয়প্রতিগ্রাহকাদিত্রিতয়ানুপলম্ভযোগেন প্রজ্ঞাপরিশোধিতাঃ সাদরনিরন্তর দীর্ঘকালম-ভ্যস্যমানাঃ প্রকর্ষপর্যন্তমুপগচ্ছন্তো ২বিদ্যাপ্রবর্তিতসকলবিকল্প-জালমলরহিতং ক্লেশজ্ঞেয়াবরণ-বিনির্মুক্তমুভনৈরাত্ম্যধিগমস্বভাবং সর্বস্বপরহিতসংপদাধার-ভূতং পরমার্থতত্ত্বাত্মকং তথাগত-ধর্মকায়মভিনির্বর্তয়ন্তীতি প্রজ্ঞাপ্রধানা দানাদয় গুণা উচ্যন্তে ।

ন চৈতদ্বক্তব্যং । যদি প্রজ্ঞা প্রধানং দানাদীনাং সৈব কেবলা সংবোধিসাধনমস্তু কিমপরৈর্দানাদিভিরিতি । তদন্যেষামুপযোগস্য বর্ণিতত্বাৎ । কেবলং নেত্রবিকলা ইব দানাদয়ঃ প্রজ্ঞানেতৃকা এব যথাভিমতাং সৌগতীং ভূমিমভিসরন্তীতি প্রজ্ঞোপনায়কা উচ্যন্তে । ন তু প্রজ্ঞৈব কেবলা সম্যক্সংবোধিসাধনং । তস্মাৎ দানাদিপরিকরঃ প্রজ্ঞার্থ ইতি সিদ্ধং ।

সর্বকল্পনাবিরহাৎ সমারোপাপবাদান্তদ্বয়মৌনাৎ অশৈক্ষকায়বাঙ্মনঃকর্মলক্ষণমৌনত্রয়যোগাদ্বা মুনিঃ বুদ্ধো ভগবান্ । ত্রিদুঃখতাদুঃখিতসর্বজরৎপরিত্রাণাধ্যাশয়ো জগৌ জগাদ উক্তবানিত্যর্থঃ । আর্যপ্রজ্ঞাপারমিতাদিসুচান্তেষু প্রজ্ঞার্থমুক্তবান্ ক্রমেণ দানাদিপরিকরং ।

যথোক্তমার্যশতসাহস্যাং প্রজ্ঞাপারমিতায়াং । তদ্যথাপি নাম সুভূতে সূর্যমণ্ডলং চন্দ্রমণ্ডলং চ চতুর্ষু দ্বীপেষু কর্ম করোতি। চতুরশ্চ দ্বীপাননুগচ্ছতি । অনুপরিবর্ততে । এবমেব সুভূতে প্রজ্ঞাপারমিতা পঞ্চসু পারমিতাসু কর্ম করোতি। পঞ্চ পারমিতা অনুগচ্ছন্তি । অনুপরিবর্ততে । প্রজ্ঞাপারমিতাবিরহিতত্বাৎ পঞ্চ পারমিতাঃ পারমিতানামধেয়ং ন লভন্তে ।। তদ্যথাপি নাম সুভূতে রাজা চক্রবর্তী বিরহিতঃ সপ্তভী রত্নৈশ্চক্রবর্তিনামধেয়ং ন লভতে । এবমেব সুভূতে পঞ্চ পারমিতাঃ প্রজ্ঞাপারমিতাবিরহিতত্বান্ন পারমিতানামধেয়ং লভন্তে ।। তদ্যথাপি নাম সুভূতে যাঃ কাশ্চন কুনদ্যঃ সর্বাস্তা যেন গঙ্গা মহানদী তেনানুগচ্ছন্তি । তা গঙ্গয়া মহানদ্যা সার্ধং মহাসমুদ্রমনুগচ্ছন্তি । এবমেব সুভূতে পঞ্চ পারমিতাঃ প্রজ্ঞাপারমিতাপরিগৃহীতা যেন সর্বাকারজ্ঞতা তেনানুগচ্ছন্তীতি বিস্তরঃ ।।

পুনশ্চোক্তং। ইয়ং কৌশিক প্রজ্ঞাপারমিতা বোধিসত্ত্বানাং মহাসত্ত্বানাং দানপারমিতামভিভবতি শীলপারমিতামভিভবতি ক্ষান্তিপারমিতামভিভবতি ধ্যানপারমিতামভিভবতি । তদ্যথাপি নাম কৌশিক জাত্যন্ধানাং শতং বা সহস্রং বা অপরিণয়কানামভব্যং মাগবিতরণায়। কুতঃ পুনর্নগরানুপ্রবেশায় । এবমেব কৌশিক অচক্ষুষ্কাঃ পঞ্চ পারমিতা জাত্যন্ধভূতা ভবন্তি বিনা প্রজ্ঞাপারমিতয়া অপরিণায়িকা বিনা প্রজ্ঞাপারমিতয়া অভব্যা বোধিমার্গাবতরণায় । কূত এব সর্বাকারজ্ঞতানগরানুপ্রবেশায় । যদা পুনঃ কৌশিক পঞ্চ পারমিতাঃ প্রজ্ঞাপারমিতাপরিগৃহীতা ভবন্তি । তদৈতাঃ পঞ্চ পারমিতাঃ সচক্ষুকা ভবন্তি। প্রজ্ঞাপারপারমিতাপরিগৃহীতাশ্চৈতাঃ পঞ্চ পারমিতাঃ পারমিতানামধেয়ং লভন্ত ইতি বিস্তরঃ ।। এবমন্যচাপি যথাসূত্রমবগন্তব্যং ।

উক্তং চ ।

সর্বপারমিতাভিস্তবং নির্মলাভিরনিন্দিতে ।

চন্দ্রলেখেব তারাভিরনুয়াতাসি সর্বদা ।।ইতি।।

অথ বা । ইমমিতি সমনন্তরপ্রক্রান্তরূপং শমথাত্মকং প্রবন্ধং । পরিকরমিতি প্রজ্ঞাসমুত্থাপকতয়া তৎকারণসংদোহং পীঠিকাবন্ধং চ । প্রজ্ঞার্থমিতি প্রজ্ঞৈব পুর্বাক্তা২র্থঃ প্রয়োজনং সাধ্যতয়া যস্য তং। শমথ-পরিশোধিতচিত্তসংতানে প্রজ্ঞায়াঃ প্রাদুর্ভাবাৎ । সুপ্রশৌধিতক্ষেত্রে সস্যনিষ্পত্তিবৎ ।

যথোক্তং শিক্ষাসমুচ্চয়ে। কিং পুনরস্য শমথস্য মাহাত্ম্যং যথাভূতজ্ঞানজননশক্তিঃ । যস্মাৎ

সমাহিতো যথাভূতং জানাতৌত্যুক্তবান্মুনিঃ ।ইতি।।

এতদপি ধর্মসংগীতাবুক্তং । সমাহিতচেতসো যথাভূতদর্শনং ভবতি । যথাভূতদর্শিনো বোধিসত্ত্বস্য সত্ত্বেষু মহাকরূণা প্রবর্ততে । ইদং ময়া সমাধিমুখং সর্বসত্ত্বানাং নিষ্পাদয়িতব্যং । স তয়া মহাকরূণয়া সংচোদ্যমানো ২ধিশীলমধিচিত্তমধিপ্রজ্ঞং চ শিক্ষা[ঃ] পরিপুর্যানুত্তরাং সম্যক্সম্বোধিমভিসংবুধ্যতে । ইতি বিস্তরঃ ।।

হিরিতি যস্মাৎ প্রজ্ঞার্থং দানাদিপরিকরং শমথাত্মকপরিকরং বা মুনির্জগৌ তস্মাদুতপাদয়েৎপ্রজ্ঞামিতি যোজনীয়ং । উৎপাদয়েদিতি নিষ্পাদয়েৎসাক্ষাৎকুর্যাৎভবয়েৎসেবয়েদ্ব-কুর্যাদ্বা ।।

সা চ প্রজ্ঞা দ্বিবিধা হেতুভূতা ফলভূতা চ । হেতুভূতাপি দ্বিবিধা। অধিমুক্তচরিতস্য চ ভূমিপ্রবিষ্টস্য চ বোধিসত্ত্বস্য। ফলভূতা তু সর্বাকারবরোপেতসর্বধর্মশূন্যতাধিগমস্বভাবা ২নিমিত্তয়োগেন । তত্র প্রথমতো হেতুভূতা শ্রুতচিন্তাভাবনাময়ী ক্রমেণাভ্যাসাদ্ভূমিপ্রবিষ্টপ্রজ্ঞাং নির্বর্তয়তি । সা চাপরাপরভূমিপ্রতিলম্ভয়োগেন প্রকর্ষমভিবর্ধয়ন্তী যাবদুভয়াবরণবিগমাৎসকলকল্পনাজালবিগতবুদ্ধত্ব-স্বভাবপ্রজ্ঞাং নিষ্পাদয়তি । অত এবাহ দুঃখনিবৃত্তিকাঙ্খায়েতি ।

দুঃখস্য পঞ্চগতিসংগৃহীতসত্ত্বরাশিগতস্য স্বাত্মগতস্য চ । সাংসারিকস্য । জাতিব্যাধিজরামরণস্বভানস্য প্রিয়বিপ্রয়োগাপ্রিয়সংপ্রয়োগপর্যেষ্যমাণলাভবিঘাতলক্ষণস্য । সংক্ষেপতঃ পঞ্চোপাদানস্কন্ধাত্মকস্য চ । নিবৃত্তিঃ । নির্বাণং । উপশমঃ । পুনরনুৎপত্তিধর্মকতয়া আত্যন্তিকসমুচ্ছেদ ইত্যর্থঃ । তস্যাঃ কাঙ্খয়া অভিলাষেণ চ্ছন্দেনেতি যাবৎ ।।

তথা হি বিপর্যাসসংজ্ঞিনো ঽসৎসত্ত্বসমারোপাভিনিবেশবশাদাত্মাত্মীয়গ্রহপ্রবৃত্তেরযোনিশো মনসি-কারপ্রসূতো রাগাদিক্লেশগণঃ সমুপজায়তে । তস্মাৎকর্ম । ততো জন্ম। ততশ্চ ব্যাধিজরামরণ-শোকপরিদেবদুঃখদৌর্মনস্যোপায়াসাশ্চ প্রজায়ন্তে । এবমস্য কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য সমুদয়ো ভবতি। তদেবমনুলোমাকারং প্রতীত্যসমুৎপাদং সম্যক্প্রজ্ঞায়া ব্যবলোকয়তঃ । পুনস্তমেব নিরাত্মকমস্বামিকং মায়ামরীচিগন্ধর্বনগরস্বপ্নপ্রতিবিম্বাদিসমানাকারতয়াস পরমার্থতো নিঃস্বভাবং পশ্যতো যথাভূতপরিজানাত্তদ্বিপক্ষাত্মতয়া মোহস্বভাবমবিদ্যাভবাঙ্গং নিবর্ততে । অবিদ্যানিরোধাত্তৎপ্রত্যয়াঃ সংস্কারা নিরুধ্যন্তে । এবং পুর্বপুর্বস্য কারণভূতস্য নিরোধাদুত্তরোত্তরকার্যভূতস্য নিরোধো বেদিতব্যঃ । যাবজ্জাতিনিরোধাজ্জরামরণশোকপরিদেবদুঃখদৌর্মনস্যোপায়াসাশ্চ নিরুধ্যন্তে । এবমস্য কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য নিরোধো ভবতি ।। তত্রাবিদ্যা তৃষ্ণোপাদানং চ ক্লেশবৎমনো ব্যবচ্ছেদঃ । সংস্কারা ভবশ্চ কর্মবৎমনো ব্যবচ্ছেদঃ । পরিশিষ্টান্যঙ্গানি দুঃখবৎমনো ব্যবচ্ছেদঃ । এবমেব ত্রিবত্ম নিরাত্মকং আত্মাত্মীয়রহিতং সংভবতি চ সংভবয়োগেন বিভবতি চ বিভবয়োগেন স্বভাবান্নড়কলাপসদৃশ ইতি । এতচ্চৌত্তরত্র বিস্তরেণ যুক্ত্যাগমাভ্যাং প্রতিপাদয়িষ্যতে ।।

তদেবং প্রজ্ঞয়া স্বপ্নমায়াদিস্বভাবং সংস্কৃতং প্রত্যবেক্ষমাণস্য সর্বধর্মনাং নিঃস্বভাবতয়া প্রতিপত্তেঃ পরমার্থাধিগমাৎসবাসননিঃশেষদোষরাশিবিনিবৃত্তির্ভবতীতি সর্বদুঃখোপশমহেতুঃ প্রজ্ঞাপপদ্যত ইতি ।।

যথা চ যুক্ত্যাগমাভ্যাং বিচারয়তো ঽবিপরীতবস্তুতত্ত্বপ্রবিচয়ঃ সমুপজায়তে । তদুপদর্শয়িতুং সত্যদ্বয় ব্যবস্থামাহ সংবৃতিরিত্যাদি ।

সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতং ।
বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতিরূচ্যতে ।।২।।

সংব্রিয়তে আব্রিয়তে যথাভূতপরিজ্ঞানং স্বভাবাবরণাদাবৃতপ্রকাশনাচ্চানয়েতি সংবৃতিঃ। অবিদ্যা মোহ বিপর্যাস ইতি পযায়া । অবিদ্যা হি অসৎপদার্থস্বরূপারোপিকা স্বভাবদর্শনাবরণাত্মিকা চ সতী সংবৃতিরূপপদ্যতে ।

যদুক্তমার্যশালিস্তত্ত্বসূত্রে। পুনরপরং তত্ত্বে ২প্রতিপত্তিমিথ্যাপ্রতিপত্তিরজ্ঞানমবিদ্যেতি । উক্তং চ ।

অভূতং খ্যাপয়ত্যর্থং ভূতমাবৃত্য বর্ততে ।
অবিদ্যা জায়মানেব কামলাতঙ্গবৃত্তিবৎ ।।ইতি।।

তদুপদর্শিতং চ প্রতীত্যসমুৎপন্নং বস্তুরূপং সংবৃতিরূচ্যতে । তদেব লোকসংবৃতিসত্যমিত্যভিধীয়তে লোকস্যৈব সংবৃত্যা তৎসত্যমিতি কৃত্বা ।। যদুক্তং ।।

মোহঃ স্বভাবাবরণাদ্ধি সংবৃতিঃ
সত্যং তয়া খ্যাতি যদেব কৃত্রিমং।
জগাদ্ তৎসংবৃতিসত্যমিত্যসৌ
মুনিঃ পদার্থং কৃতকং চ সংবৃতিং ।। ইতি।।

সা চ সংবৃতিদ্বিবিধা লোকত এব। তথ্যসংবৃতির্মিথ্যাসংবৃতিশ্চেতি। তথা হি কিং চিৎপ্রতীত্যজানং নীলাদিকং বস্তুরূপমদোষবদিন্দ্রিয়ৈরূপলব্ধং লোকত এব সত্যং। মায়ামরীচিপ্রতিবিম্বাদিষু প্রতীত্য-সমুপজাতমপি দোষবদিন্দ্রিয়োপলব্ধং যথাস্বং তীর্থিকসিদ্ধান্তপরিকল্পিতং চ লোকত এব মিথ্যা। তদুক্তং ।

বিনোপঘাতেন যদিন্দ্রিয়াণাং
ষস্মামপি গ্রাহ্যমবৈতি লোকঃ।
সত্যং হি তল্লোকত এব শেষং
বিকল্পিতং লোকত এব মিথ্যা ।। ইতি ।।

এতত্তদুভয়মপি সম্যগ্দৃশামার্যাণাং মৃষা পরমার্থদশায়াং সংবৃতিসত্যালীকত্বান্ । এতৎসমনন্তরমেবোপপত্ত্যা প্রতিপাদয়িব্যামঃ । তস্মাদবিদ্যাবতাং বস্তুস্বভাব ন প্রতিভাসত ইতি ।।

পরম উত্তমোঽর্থঃ পরমার্থ। অকৃত্রিমং বস্তুরূপং যদভিগমাৎসর্বাবৃতিবাসনানুসংধিক্লেশপ্রহাণং ভবতি । সর্বধর্মাণাং নিঃস্বভাবতা । শূন্যতা তথতা ভূতকোটিঃ । ধর্মধাতুরিত্যাদিপর্যায়াঃ । সর্বস্য হি প্রতীত্যসমুৎপন্নস্য পদার্থস্য নিঃস্বভাবতা পারমার্থিকং রূপং । যথাপ্রতিভাসং সাংবৃতস্যানুপপন্নত্বাৎ ।।

তথা হি । ন তাবদ্যথাপরিদৃশ্যমানরূপেণ সৎস্বভাব ভাবঃ । তস্যোত্তরকালমনবস্থানাৎ । স্বভাবস্য চ সর্বদা ঽনাগন্তুকতয়া ঽবিচলিতরূপত্বাৎ । যো হি যস্য স্বভাবঃ স কথং কদা চিরপি নিবর্তেত । অন্যথা তস্য স্বভাবতাহানিপ্রসঙ্গান্নিঃস্বভাবতৈব স্যাৎ । নাপি স উৎপদ্যমানঃ সৎস্বরূপেণ কুতশ্চিদাগচ্ছতি নিরুধ্যমানো বা ক্ক চিৎসংনিচয়ং গচ্ছতি ।। অপি তু হেতুপ্রত্যয়সামগ্রীং প্রতীত্য মায়াবদুৎপদ্যতে। তদ্বৈকল্যতো নিরুধ্যতে চ । হেতুপ্রত্যয়সামগ্রীং প্রতীত্য জাতস্য পরায়ত্তাত্মলাভস্য প্রতিবিম্বস্যেব সৎস্বভাবতা ।

ন চ কস্য চিৎপদার্থস্য পরমার্থততো হেতুপ্রত্যয়সামগ্রীতঃ সমুৎপত্তিঃ সংভবতি । তস্যা অপ্যপরসামগ্রীজনিতাত্মতয়া পরায়ত্তাত্মলাভায়া নিঃস্বভাবত্বাৎ । এবমন্যস্যাঃ পূর্বপূর্বায়া স্বস্বকারণসামগ্রীজন্যতয়া নিঃস্বভাবতা দৃষ্টব্যা । ইত্থং কারণানুরূপং কার্যমিচ্ছতা কথং নিঃস্বভাবাৎসৎস্বভাবস্যোৎপত্তিরভ্যুপেতব্যা । যদ্বক্ষ্যতি ।

মায়য়া নির্মিতং যচ্চ হেতুভির্যচ্চ নির্মিতং ।
যাতি তৎকুতঃ কুত্র যাতি চেতি নিরূপ্যতাং ।।
যদন্যসংনিধানেন দৃষ্টং ন তদভাবতঃ ।
প্রতিবিম্বসমে তস্মিন্ কৃত্রিমে সত্যতা কথং । ইতি ।

উক্তং চ ।

যঃ প্রত্যয়ৈর্জায়তি স হ্যজাতো
ন তস্য উৎপাদু স্বভাবতো ঽস্তি ।
যঃ প্রত্যযাধীনু স শূন্য উক্তো
যং শূন্যতাং জানতি সো ঽপ্রমত্তঃ ।। ইতি ।
ইতি শূন্যেভ্য এব শূন্যা ধর্মা প্রভবন্তি ধর্মেভ্য ইতি ।।

ন চ স্বপরোভয়রূপহেতুনিবন্ধনমহেতুনিবন্ধনং বা ভাবস্য জন্মাতিপেশলমুপপদ্যতে । তথা হি আত্মস্বরূপং ভাবানাং স্বজন্মনিমিত্তং ভবেৎ । নিষ্পন্নমনিষ্পন্নং বা ভবেৎ । ন তাবন্নিষ্পন্নস্য সতঃ স্বাত্মনি কারণতা । তস্য সর্বাত্মনা স্বয়ং নিষ্পন্নত্বাৎ ক পুনরস্য ব্যাপারো ঽস্তু। উৎপাদ্যস্য পুনরস্যানিষ্পন্নস্যান্যস্য স্বভাবস্যাভাবান্ । একস্য চাস্য নিরংশত্বাৎ । ন চ পঞ্চাদুৎপদ্যমানস্যাপরস্য তৎস্বভাবতা যুক্তা । তন্নিষ্পত্তবনিষ্পন্নস্য তৎস্বভাবত্বাভাবান্। ইতি ন স্বাত্মনো নিষ্পন্নাৎকস্য চিদুৎপত্তিরস্তি । ন চাপি স্বত উৎপত্তিপক্ষে প্রাঙ্নিষ্পন্নং স্বরূপমিতরেতরাশ্চযদোষপ্রসঙ্গাৎকস্য চিৎসংভবতি । নাপি তদনিষ্পন্নস্বভাবমাকাশকুশেশযসংকাশমশেষসামর্থ্যশূন্যং স্বনিষ্পত্তৌ হেতুভাবমুপ-গন্তুমর্হতি । অন্যথা স্বরবিষাণস্যাপি স্বস্বভাবজনকত্বপ্রসঙ্গাৎ ।।

নাপি পরত ইতি পক্ষঃ । আদিত্যাদপ্যন্ধকারস্য সর্বস্মাদ্বা সর্বস্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গাতঃ । জনকাজনকাভি-মতযোর্বিবক্ষিতকার্যাপেক্ষয়া পরত্বাবিশেষাৎ । জন্যজনকৈকত্বৈকসংততিপ্রতিনিয়মো ঽপ্যনুৎপন্নে কার্যে

কাল্পনিকতয়া বস্তুত ন সংগচ্ছতে । ন চানাগতাবস্থিতধর্মাপেক্ষয়া কার্যাদিব্যবহার বাস্তবঃ । অর্থস্বভাবসদ্ভাবস্য নিরূপয়িষ্যমাণত্বাৎ । নাপি বীজাবস্থাসু বিদ্যমানাঙ্কুরাপেক্ষয়া বীজস্য পরত্বমকাল্পনিকমস্তি । কারণে কার্যাস্তিত্বস্য নিষেৎস্যমানত্বাৎ । যত্র পরিদৃশ্যমানমেব রূপং বিচারত নাবতিষ্টতে তত্রানাগতাদিষু সংভাবিতস্য কা চিন্তা ।।

নাপ্যুভয়ত ইতি পক্ষঃ । প্রত্যেকপক্ষোক্তসমুদিতদোষপ্রসঙ্গাৎ । কার্যানুৎপত্তৌ চোভয়রূপস্য হেতোঃ পরমার্থত২ভাবাৎ । উৎপত্তৌ বা ন কিং চিজ্জনয়িতব্যমস্তীতি কুত্রোভয়রূপস্য হেতোর্বাপারঃ স্যাৎ ।।

নাপ্যহেতুত ইতি বিকল্পঃ। যতো নায়ং প্রসজ্যপ্রতিষেধাত্মতয়া অহেতুত ইতি যুজ্যতে। অহেতুকত্বে হি ভাবানাং দেঅকালনিয়মাভাবপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। নিত্যং সত্ত্বাসত্তবপ্রসঙ্গো বা। উপেয়ার্থিনাং প্রতিনিয়তোপায়ানুষ্ঠানং চ ন স্যাৎ। প্রধানেশ্চরাদীনাং কারণত্বে অস্য প্রতিষেভধস্যেষ্যমাণত্বাৎ। তন্নাহেতুতো ভাবাঃ স্বভাবং প্রতিলভন্তে।।

তস্মান্ন স্বপরোভয়রূপহেত্বহেতুভ্য উৎপদ্যন্তে সৎস্বভাবা ভাবাঃ । তদুক্তং ।

ন স্বত নাপি পরত ন দ্বাভ্যাং নাপ্যহেতিতঃ ।
উৎপন্না জাতু বিদ্যন্তে ভাবাঃ ক্ক চেন কে চন ।। ইতি ।।

একানেকস্বভাববিচারণয়াপি সর্বভাবানাং স্বভাববিকলত্বান্ন সৎস্বভাবত্বং । তস্মাৎস্বপ্নমায়াপ্রতিবিম্বাদিবদিদংপ্রত্যয়াতামাত্রমেব অবিচারমনোহরমস্তু কিমিহ সর্বদুঃখহেতুনা ভাবাভিনিবেশেন প্রয়োজনং । অত ইদমর্থস্য তত্ত্বং ।

নিঃস্বভাবা অমী ভাবাস্তত্ত্বতঃ স্বপরোদিতাঃ ।
একানেকস্বভাবেন বিয়োগাৎপ্রতিবিম্ববৎ ।।

এবং নিঃস্বভাবতৈব সর্বভাবানাং নিজং পারমার্থিকং রূপমবতিষ্টতে ।। তদেব প্রধানপুরুষার্থতয়া পরমার্থ উৎকৃষ্টং প্রয়োজনমভিধীয়তে ।।

অত্রাপি নাভিনিবেষ্টব্যং । অন্যথা ভাবাভিনিবেশো বা শূন্যতাভিনিবেশ বেতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ । উভয়োরপি কল্পনাত্মকতয়া সাংবৃতত্বাৎ । ন চাভাবস্য কল্পিতস্বংভাবতয়া কিং চিৎস্বরূপমস্তি । ন চ ভাবনিবৃত্তিরূপ ২ভাব নিবৃত্তের্নিঃস্বভাবত্বাৎ । যদি চ ভাবস্যৈব কশ্চিৎস্বভাবঃ স্যাৎ তদা তৎপ্রতিষেধাত্মা ২ভাবো ২পি স্যাৎ । ভাবস্য তু স্বভাব নাস্তীতি প্রতিপাদিতমেব । অতো ন ভাবনিবৃত্তিরূপ ২ভাব নাম কশ্চিৎ । ন চ ভাবাভাবয়োরূক্তক্রমেণাসত্ত্বে প্রতিপাদিতে তদুভয়সংকীর্ণাত্মতা সংভবতি । উভয়প্রতিষেধস্বভাবতা বা । ভাববিকল্পস্যৈব সকলবিকল্পনিবন্ধন-ত্বাত্তস্মিন্নিরাকৃতে সর্ব এবামী একপ্রহারেণ নিরস্তা ভবন্তীতি। তস্মাৎ ।

ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চাপ্যনুভয়াত্মকং

কিং চিদভিনিবেশবিষয়তয়া মন্তব্যং । তদুক্তমার্যাপ্রজ্ঞাপারমিতায়াং । সুভূতিরাহ । দ্বহায়ুষ্মন্ শারদ্ব-তীপুত্র বোধিসত্ত্বয়ানিকঃ কুলপুত্র বা কুলদুহিতা বা ২নুপায়কুশল রূপং শূন্যমিতি প্রজ্ঞানাতি সঙ্গঃ । বেদনাং শূন্যামিতি সংজানাতি সঙ্গঃ । সংজ্ঞাং শূন্যামিতি সংজানাতি সঙ্গঃ । সংস্কারান্ শূন্যানিতি সংজানাতি সঙ্গ্ । বিজ্ঞানং শূন্যমিতি সংজানাতি সঙ্গঃ । এবং চক্ষুঃ শ্রোত্রঃ ঘ্রাণং জিহ্বা কায় মনঃ । যাবৎসর্বধর্মশূন্যতাং শূন্যামিতি সংজানাতি সঙ্গ ইতি বিস্তরঃ ।।

উক্তং চ ।

সর্বসংকল্পহানায় শূন্যতামৃতদেশনা ।
যস্য তাস্যামপি গ্রাহস্তবয়াসাববসাদিতঃ ।। ইতি ।
ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চাপ্যনুভয়াত্মকং ।
চতুষ্কোটিবিনিমুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ ।। ইতি ।

এবং চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তমাদিশান্তমনুৎপন্নানিরুদ্ধানুচ্ছেদাশাশ্বতাদিস্বভাবতয়া নিঃপ্রপঞ্চত্বাদাকাশবদাসঙ্গানামনাস্পদমশেষং বিশ্বমুৎপশ্যাম ইতি ।।

সত্যদ্বয়মিদং মতমিতি । কিং তৎ । সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চেতি পশ্চাদোজ্ঞানীয়ং । ভূতমিয়ং ব্রাহ্মণী আবপনমিয়ং মুষ্টিকেতি যথা ।

সংবৃতিরেকং সত্যমবিপরীতং । পরমার্থশ্চাপরং সত্যমিতি । চকারঃ সত্যতামাত্রেণ ২তুল্যবলতাং সমুঞ্চিনতি । তত্র সংবৃতিসত্যমবিতথং রূপং লোকস্য। পরমার্থসত্যং চ সত্যমবিসংবাদকং তত্ত্বমার্যাণামিতি বিশেষঃ । ইত্থং বিশেষোপদর্শনার্থ ২পি যুক্তশ্চকারঃ ।।

তেদিক্তং ভবতি । সর্ব এবামী আধ্যাত্মিকা বাহ্যাভাবাঃ স্বভাবদ্বয়মাবিভ্রতঃ সমুপজায়ন্তে। যদুত সাংবৃতং পারমার্থিকং চ । তত্রৈকমবিদ্যাতিমিরাবৃতবুদ্ধিলোচনানামভূতার্থদর্শিনাং পৃথক্জনানাং মৃষাদর্শনবিষয়তয়া সমাদর্শিতাত্মসত্তাকং । অন্যৎপ্রবিচয়াঞ্জনশলাকোদ্ঘাতিতাবিদ্যাপটলসম্যক্জ্ঞাননয়নানং তত্ত্ববিদামার্যাণাং সম্যগ্দর্শনবিষয়তয়োপস্থিতস্বরূপং ।

তদেতৎস্বভাবদ্বয়ং সর্বে পদার্থাং ধারয়ন্তি । অনয়োশ্চ স্বভাবয়োর্মৃষাদৃশাং বালিশানাং যো বিষয়স্তৎসংবৃতিসত্যং । যশ্চ সম্যগ্দৃশামধিগততত্ত্বানাং বিষয়স্তৎপরমার্থসত্যমিতি । ব্যবস্থা শাস্ত্রবিদাং । যদাহ ।

সম্যগ্মৃষাদর্শনলব্ধভাবং
রূপদ্বয়ং বিভ্রতি সর্বভাবাঃ ।
সম্যগ্দৃশাং যো বিষয়ঃ স তত্ত্বং
মৃষাদৃশাং সংবৃতিসত্যমুক্তং ।। ইতি ।।

ইতি দ্বয়ঃ সমুদায় দ্বয়মিতি যুজ্যতে । মতমিতি সংমতমভিমতং । কেষাং । প্রহীণাবরণধিয়াং বুদ্ধানাং ভগবতাং তন্মার্গানুযায়িনামার্যশ্রাবকপ্রত্যেকবুদ্ধবোধিসত্ত্বানাং চ । ইদমেব সত্যদ্বয়ং নান্যৎসত্যমস্তীতি । অবধারণার্থো ঽপি যুজ্যতে চকারঃ । তদুক্তং ।

দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা ।
লোকসংবৃতিসত্যং চ সত্যং চ পরমার্থতঃ ।। ইতি ।

পিতাপুত্রসমাগমে চোক্তং ।

সত্য ইমে দুবি লোকবিদূনাং
দিষ্ট স্বয়ং অশ্রুণিত্বপরেষাং ।
সংবৃতি যা চ তথা পরমার্থা
সত্যু ন সিধ্যতি কিং চ তৃতীয়ু ।। ইতি ।।

ননু চত্বারি আর্যসত্যানি দুঃখসমুদয়নিরোধমার্গলক্ষণানি অভিধর্মে কথিতানি ভগবতা । তৎকথং দ্বে এব সত্যে ইতি । সত্যং । কিং তর্হি বৈনেয়জনাশয়ানুশয়বশাদেতে দ্ব এব চত্বারি কৃত্বা কথিতানি । অমীষাং দ্বয়োরেবান্তর্ভাবাৎ । তথা হি দুঃখসমুদয়মার্গসত্যানি সংবৃতিস্বভাবতয়া সংবৃতিসত্যে ঽন্তর্ভবন্তি । নিরোধসত্যং তু পরমার্থসত্য ইতি ন কশ্চিদ্বিরোধঃ ।।

স্যাদেতৎসংবৃতিরবিদ্যোপদর্শিতাত্মতয়া ঽভূতসমারোপস্বরূপত্বাদ্বিচারাচ্ছতশ বিশির্যোমাণাপি কথং সত্যমিতি । এতদপি সত্যং । কিং তু লোকাধ্যবসায়তঃ সংবৃতিসত্যমিত্যুচ্যতে । লোক এব হি সংবৃতিসত্যমিহ প্রতিপন্নঃ । তদনুবৃত্ত্যাভগবদ্ভিরপি তথৈবানপেক্ষিততত্ত্বার্থিভিঃ সংবৃতিসত্যমুচ্যতে । অত এব লোকসংবৃতিসত্যং চেতি শাস্ত্রে ঽপি বিশেষ উক্ত আচার্যপাদৈঃ । বস্তুতস্তু পরমার্থ এবৈকং সত্যমত ন কা চিৎক্ষতিরিতি ।।

যথোক্তং ভগবতা । একমেব ভিক্ষবঃ পরমং সত্যং যদুতাপ্রমোষধর্ম নির্বাণং সর্বসংস্কারাশ্চ মৃষা মোষধর্মাণ ইতি ।।

সত্যদ্বয়মিদমুক্তং । তত্রাবিদ্যোপপ্লুতচেতসাং তৎস্বভাবতয়া সংবৃতিসত্যমিতি প্রতীতং । পরমার্থ-সত্যং তু ন জ্ঞায়তে কীদৃক্কিংস্বভাবং কিংলক্ষণমিতি । অতো বক্তব্যং তৎস্বরূপমিতি । অত আহ বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বমিতি ।

বুদ্ধে সর্বজ্ঞানানাং । সমতিক্রান্তসর্বজ্ঞানবিষয়ত্বাদগোচরঃ । অবিষয়ঃ । কেন চিৎপ্রকারেণ তৎসর্ব-[বুদ্ধি]বষয়ীকতুং ন শক্যত ইতি যাবৎ । ইতি কথং তৎস্বরূপং প্রতিপাদয়িতুং শক্যং । তথা হি সর্বপ্রপঞ্চবিনির্মুক্তস্বভাবং পরমার্থ[সত্য]তত্ত্বং । আতঃ সর্বোপাধিশূন্যত্বাৎকথং কয়া চিৎকল্পনয়া পশ্যেত । কল্পনাসমতিক্রান্তস্বরূপং চ শব্দানামবিষয়ঃ । বিকল্পজন্মানো হি শব্দাবিকল্পধিয়ামবিষয়ে [ন] প্রবর্তিতুমুৎতসহন্তে । তস্মাকসকলবিকল্পাভিলাপবিকলত্বাদনারোপিতমসাংবৃতমনভিলাপ্যং পর-মার্থতত্ত্বং কথমিবপ্রতিপাদয়িতুং শক্যতে । তথাপি ভাজনশ্রোতৃজনানুগ্রহার্থং [পরিকল্পমুপাদায়] সংবৃত্যানিদর্শনোপদর্শনেন কিং চিদভিধীয়তে ।।

যথা তিমিরপ্রভাবাততৈমিরিকঃ সর্বমাকাশদেশং কেশোন্ডুকমন্ডিতমিতস্ততো মুখং বিক্ষিপন্নপি পশ্যতি। তথা কুর্বন্তমবেত্যাতৈমিরিকঃ কিময়ং করোতীতি তৎসমীপমুপস্টত্য তদুপলব্ধকেশপ্রণিহিতলোচন ২পি ন কেশকৃতিমুপলভতে । নাপি তৎকেশাধিকরণাৎ ভাবাভাবাদিবিশেষান্ পরিকল্পয়তি । যদা পুনরসৌ তৈমিরিক ২তৈমিরিকায় স্বাভিপ্রায়ং প্রকাশয়তি কেশানিহ পশ্যামীতি । তদা তদ্বিকল্পাপসারণায় তস্মৈ যথাভূতমসৌ ব্রবীতি । নাত্র কেশাঃ সন্তীতি তৈমিরিকোপলব্ধানুরিধেন প্রতিষেধপরমেব বচনমাহ । ন চ তেন তথা প্রতিপাদয়তাপি কস্য চিৎপ্রতিষেধঃ কৃতো ভবতি বিধানং বা । তচ্চ কেশানাং তত্ত্বং যত্তৈমিরিকঃ পশ্যতি তন্নাতৈমিরিকঃ ।।

এবমবিদ্যাতিমিরোপঘাতাদতত্ত্বদৃশো বালা যদেতৎস্কন্ধধাত্বায়তনাদিস্বরূপমুপলভন্তে তদেশাং সাংবৃতং রূপং । তানেব স্কন্ধাদীন্যেন স্বভাবেন নিরস্তসমস্তাবিদ্যাবাসনা বুদ্ধা ভগবন্তঃ পশ্যন্তি । অতৈমিরিকোপলব্ধকেশদর্শনন্যায়েন । তদেষাং পরমার্থসত্যমিতি ।

যদাহ শাস্ত্রবিৎ ।

বিকল্পিতং যত্তিমিরপ্রভাবাৎ
কেশাদুরূপং বিতথং তদৈব ।
যেনাত্মনা পশ্যতি শুদ্ধদৃষ্টি -
স্তত্তত্ত্বমিত্যেবমিহাপ্যবৈহি ।। ইতি ।

ইতি পরমার্থতিঅবাচ্যমপি পরমার্থংতত্ত্বং দৃষ্টান্তদ্বারেণ সংবৃতিমুপাদায় কথং চিৎকথিতং । ন তু তদশেষসাংবৃতব্যবহারবিরহিতস্বভাবং বস্তুত বক্তুং শক্যত ইতি ।। যদুক্তং ।

অনক্ষরস্য ধর্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা ।
শ্রুয়তে দেশ্যতে চার্থঃ সমারোপাদনক্ষরঃ ।। ইতি ।

তস্মাদ্ব্যবহারসত্য এব স্থিত্বা পরমার্থা দেশ্যতে । পরমার্থদেশনাবগমাদ্ধ পরমার্থাধিগমো ভবতি । তস্যাস্তদুপায়ত্বাৎ । যদুক্তং শাস্ত্রে

ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থা ন দেশ্যতে ।
পরমার্থমনাগম্য নির্বাণং নাধিগম্যতে ।। ইতি ।

এবং পরমার্থদেশনোপায়ভূতা পরমার্থাধিগমশ্চোপেয়ভূত ইতি । অন্যথা তস্য দেশয়িতুমশক্যত্বাৎ ।। ননু চ তথাবিধমপি তথাবিধবুদ্ধিবিষয়ঃ পরমার্থতঃ কিং ন ভবতীত্যত্রাহ। বুদ্ধিঃ সংবৃতিরুচ্যত ইতি ।

সর্বা হি বুদ্ধিরালম্বননিরালম্বনতয়া বিকল্পস্বভাবা । বিকল্পশ্চ সর্ব এবাবিদ্যাস্বভাবঃ। অবস্তুগ্রাহিত্বাৎ। যদাহ ।

বিকল্পঃ স্বয়মেবায়মবিদ্যারূপতাং গতঃ । ইতি ।

অবিদ্যা চ সংবৃতিঃ । ইতি নৈব কা চিদ্বুদ্ধিঃ পারমার্থিকরূপগ্রাহিণী পরমার্থত যুজ্যতে । অন্যথা সাংবৃতবুদ্ধিগ্রাহ্যতয়া পরমার্থরূপতৈব সত্য হীয়েত । পরমার্থস্য বস্তুতঃ সাংবৃতজ্ঞানাবিষয়ত্বাৎ ।।

তত্র চেদমুক্তং ভগবতার্যসত্যদ্বয়াবতারে । যদি হি দেবপুত্র পরমার্থতঃ পরমার্থসত্যং কায়বাঙ্মনসাং বিষয়তামুপগচ্ছেৎ । ন তৎপরমার্থসত্যমিতি সংখ্যাং গচ্ছেৎ । সংবৃতিসত্যমেব তদ্ভবেৎ । অপি তু দেবপুত্র পরমার্থসত্যং সর্বব্যবহারসমতিক্রান্তং নির্বিশেষং । অসমুৎপন্নমনিরুদ্ধং । অভিধেয়াভিধানজ্ঞেয়জ্ঞানবিগতং । যাবৎসর্বাকারবরোপেতসর্বজ্ঞজ্ঞানবিষয়ভাবসমতিক্রান্তং পরমার্থসত্য-মিতি বিস্তরঃ ।

অত এব তদবিষয়ঃ সর্বকল্পনানাং যদ্ভাবাভাব[স্ব]পরভাবসত্যাসত্যশাশ্বতোচ্ছেদনিত্যানিত্যসুখদুঃখ-শুচ্যশুচ্যাত্মানাত্মশূন্যালক্ষণৈকত্বান্যত্বো-ৎপাদনিরোধাদয়ো বিশেষাস্তত্ত্বস্য ন সংভবন্তি । অমীষাং সাংবৃতধর্মত্বাৎ ।।

এতদুক্তং ভগবতা পিতাপুত্রসমাগমে । এতাবচ্চৈব জ্ঞেয়ং যদুত সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ। তঞ্চ ভগবতা শূন্যতঃ সুদৃষ্টং সুবিদিতং সুসাক্ষাৎকৃতং । তেন সর্বজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। তত্র সংবৃতির্লোকপ্রচারতস্তথাগ-তেন দৃষ্টা । যঃ পুনঃ পরমার্থঃ সো ঽনভিলাপ্যঃ। অনাজ্ঞেয়ঃ । অপরিজ্ঞেয়ঃ । অবিজ্ঞেয়ঃ । অদেশিতঃ । অপ্রকাশিতঃ। যাবদক্রিয়ঃ । অকরণঃ । যাবন্ন লাভ নালাভ ন সুখং ন দুঃখং ন যশো নাযশো ন রূপং নারূপমিত্যাদি ।

ইতি প্রত্যস্তমিতসমস্তসাংবৃতবস্তুবিশেষমশেষোপাধিবিবিক্তমুক্তমনন্তবস্তুবিস্তরব্যাপিজ্ঞানালোকাবভাসি-তান্তরাত্মনা ভগবতা পরমার্থসত্যমিতি । তদেতদার্যাণামেব স্বসংবিদিতস্বভাবতয়া প্রত্যাত্মবেদ্যং । অতস্তদেবাত্র প্রমাণং । সংবৃতিসত্যং তু লোকব্যবহারমাশ্রিত্য প্রকাশিতং । তদেবং যথাবদ্বিভাগতঃ সত্যদ্বয়পরিজ্ঞানাদবিপরীত ধর্মপ্রবিচয় উপজায়তে ।।

এবং সংবৃতিপরমার্থভেদেন দ্বিবিধং সত্যং ব্যবস্থাপ্য তদধিকৃতশ্চ লোকোঽপি দ্বিবিধ এবেত্যুপদর্শয়-ন্নাহ। তত্র লোক ইত্যাদি ।

-: দ্বিতীয় অধ্যায় :-

পারমিতার স্বরূপ অন্বেষণ

এই অধ্যায়ে আমি পারমিতার স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করব। যেহেতু প্রজ্ঞা একটি পারমিতা তাই প্রজ্ঞার আলোচনা করার আগে পারমিতার আলোচনা একান্ত আবশ্যক।

বৌদ্ধশাস্ত্রে মানবতার পূর্ণ বিকাশের জন্য অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে বিশিষ্ট সাধন প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে, তার নাম পারমিতা। 'পারমিতা' শব্দের অর্থ যাহা পারে গিয়াছে অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়েছে। সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত 'পারমিতা' শব্দটি পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে 'পারমী' নামে কথিত হয়। উক্ত হয়েছে - গৌতম বুদ্ধ তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মে দশবিধ সদ্‌গুণের বিকাশ সাধন করতে করতে গৌতম সিদ্ধার্থ জন্মে 'দশ পারমিতা' পূর্ণ করে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রের দশটি পারমিতা (পারমী) যথা - ১) দান, ২) শীল, ৩) ক্ষান্তি, ৪) বীর্য, ৫) ধ্যান, ৬) প্রজ্ঞা, ৭) সত্য, ৮) অধিষ্ঠান, ৯) মৈত্রী ও ১০) উপেক্ষা। জাতক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, বোধিসত্ত্ব গৌতম আনুমানিক ৫৫০ জন্মের মধ্যে দিয়ে দশ পারমিতা পূর্ণ করে সম্যক সম্বোধি রূপ লোকোত্তর সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহাযানী সাধকগণ বোধিচিত্ত গ্রহণের পর প্রথম ছয়টি পারমিতা সাধনাকে আবশ্যক চর্যারূপে অবলম্বন করে থাকেন।

আমার সন্দর্ভের মূল যে লক্ষ্য তা প্রতিপাদন করতে হলে বাকি পাঁচটি পারমিতার স্বরূপ জানা প্রয়োজন, তাহলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে, অন্যান্য পারমিতার তুলনায় কেন প্রজ্ঞা পারমিতাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। আবার, প্রজ্ঞা প্রধান হলেও অন্যান্য পারমিতার অনুশীলনেরও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। দান, শীলাদি পারমিতার অনুশীলন ব্যতীত প্রজ্ঞা লাভ সম্ভব নয়।

দান পারমিতা : দান হল বোধিচর্যার উদ্দেশ্যে প্রথম ধাপ। দান পারমিতা বলতে বোঝায় ব্যক্তির এমন গুণ যা ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ স্তরে বা পারমীতে অবস্থান করায়। দান শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল দেওয়া (giving)। এর সমার্থক শব্দ হল উদারতা, দানশীলতা ইত্যাদি। ত্যাগের (pali : cāga) অনুশীলন করা হল দানেরই সমার্থক।[১]

মানুষ স্বভাবতঃ স্বার্থপর, দানের অনুশীলন দ্বারা তার স্বার্থবুদ্ধি দূর হয় এবং আত্মপ্রসার সাধিত হয়। সর্ব জীবের নিমিত্ত সকল বস্তু দান বা ত্যাগ করা এবং তার সাথে দানফলও পরিত্যাগ করা - তাই হল 'দান পারমিতা'র সাধনা। *রত্নমেঘ* নামক মহাযান সূত্রে বলা হয়েছে - ''দানং হি বোধি সত্ত্বস্য বোধিঃ''। বোধিসত্ত্বের বোধি দানেই প্রতিষ্ঠিত, বোধিসত্ত্বকে এইরূপ সংকল্প গ্রহণ করতে হয় যে, যার যে বস্তুর প্রয়োজন, কোনও প্রকার শোক না করে তাকে সেই বস্তু প্রদান করব।

অশোচন্ন বিপ্রতিসারী অবিপাক-প্রতিকাঙ্ক্ষী পরিত্যক্ষ্যামি।

(শিক্ষাসমুচ্চয়)

সাধারণভাবে মনে হয় দান একটি বাহ্য আচরণ, তার সাথে চিত্তের কোনো যোগ নেই। কিন্তু শান্তিদেব মনে করেন দান পারমিতাও চিত্ত প্রধান। কেবল অত্যধিক বাহ্যদানে দান পারমিতা সাধনা সম্পাদিত হয় না। দান-পারমিতার মান লক্ষণ সম্বন্ধে আচার্য শান্তিদেব তাঁর *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে উক্ত করেছেন,

---

১। Har Dayal , *The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature* , Delhi ,Motilal Banarsidass Private Limited , 1932 . pg – 166.

ফলেন সহ সর্বস্ব ত্যাগ চিত্তাজ্জনেঽখিলে।
দান পারমিতা প্রোক্তা তস্মাৎ সা চিত্তমেব তু।।[২]

(বোধিচর্যাবতার ৫।১০)

সকল কাম্যবস্তু সর্বজনের জন্য ত্যাগ করতে হবে। এই ত্যাগের যে ফল (স্বর্গাদি) তাও সর্বজনকে ত্যাগ করতে হবে। এইরূপে ক্রমাগত দান অভ্যাসের দ্বারা মাৎসর্য-বিহীন, নির্মল, নিরাসক্তচিত্ত উৎপন্ন হয়, তাই 'দান-পারমিতা' নামে অভিহিত হয়। সুতরাং চিত্তের অবস্থা বিশেষই 'দান-পারমিতা'। দান পারমিতার সাধক বোধিসত্ত্ব এইরূপে বিচার করে থাকেন :

সর্ব ত্যাগশ্চ নির্বাণং নির্বাণার্থিচ মে মনঃ ।
ত্যক্তব্যং চেস্ময়া সর্বং বরং সত্ত্বেষু দীয়তাম্ ।।[৩]

(বোধিচর্যাবতার ৩-১১)

নির্বাণ লাভ করতে হলে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। আমার মন নির্বাণ-কামী, অতএব, সমস্তই যখন আমাকে ত্যাগ করে যেতে হবে, তখন তা প্রাণীসকলকে দান করাই শ্রেয়। *বোধিচর্যাবতারে* বলা হয়েছে, এইরূপে বিচার করে বোধিসত্ত্ব নিজের শরীর পর্যন্ত সকল প্রাণীর সেবার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় দান করে থাকেন। সেখানে বলা হয়েছে, 'সকল জীবের যথেচ্ছ সুখ লাভের নিমিত্ত আমার এই দেহ। আঘাত করুক, নিন্দা করুক, ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন করুক, ইহা দ্বারা ক্রীড়া-হাস্য-বিলাসাদি তাদের সুখকর যে কোন কার্য করুক, তাদেরকেই আমি আমার দেহ সমর্পণ করেছি, নিজের সুখ-দুঃখের চিন্তায় আর আমার কী অধিকার?''

২। *বোধিচর্যাবতার* , ৫।১০

৩। *বোধিচর্যাবতার* , ৩-১১

বুদ্ধবংসো নামক পালি গ্রন্থ থেকে জানা যায়, গৌতম সিদ্ধার্থ ৫৫০ জন্মের পূর্বে যখন সুমেধ ব্রহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখনই তিনি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য 'দান-পারমিতা' সাধনা পূণর করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন।

মহাযান বৌদ্ধদের কাছে দান পারমিতার বিশেষ গুরুত্ব আছে। দানের উল্লেখ আছে উপনিষদে, গৃহ্যসূত্রে এবং অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্রে। এছাড়াও, পালি সাহিত্যের বিধিন্ন প্রবন্ধেও লক্ষণ, পদ্ধতি ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা আছে।

শীল পারমিতা : আচার্য অশ্বঘোষ 'শীল' শব্দের নির্দেশ করেছেন - শীলানাৎ শীলম্ ইত্যুক্তম''[৪] (সোন্দরানন্দম, ১৩/২৭)। পুনঃ পুনঃ আচরণ করা হয় বলে একে শীল বলে। শীলোক্ত অনুশাসনগুলি পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে অভ্যাসে পরিণত করতে হয়।

প্রাণী হিংসা থেকে বিরতি, পরস্বাপহরণ থেকে বিরতি, ব্যভিচার থেকে বিরতি, মিথ্যাকথন থেকে বিরতি এবং মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরতি- বৌদ্ধশাস্ত্রে যা পঞ্চশীল নামে খ্যাত। এই পাঁচটি পাপকর্ম হল সংসারের যাবতীয় দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষের মূল কারণ। এই কারণে মানবতার অগ্রগতির জন্য কার্যকরী পন্থারূপে বুদ্ধদেব নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'পঞ্চশীল' প্রত্যেকেরই অবশ্য অনুষ্ঠেয় প্রথমিক কর্তব্য।

আচার্য শান্তিদেব *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের শীল পারমিতা সাধনা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, চিত্ত থেকে পাপ বা পুণ্য কর্মের উদ্ভব হয়ে থাকে। চিত্ত বিশোধিত না হলে পাপ কর্ম থেকে যথার্থ বিরতি সম্ভবপর হয় না। হিংসা, চৌর্য, ব্যভিচারাদি-বাহ্যকর্ম থেকে বিরত হয়েও ব্যক্তি মনে মনে এই সমস্ত পাপকর্মের প্রতি অনুরাগ

৪। *সোন্দরানন্দম* , ১৩।২৭

পোষণ করতে পারে। এই অবস্থায় শীল সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং শীল পরিশুদ্ধির জন্য 'চিত্ত পরিকর্ম' বা চিত্ত শোধন একান্ত আবশ্যক। এই কারণে আচার্য শান্তিদেব বলেছেন, ''লব্ধে বিরতিচিত্তে তু শীল পারমিতা মতো''[৫] (বোধিচর্যাবতার ৫।১১)।

শীল পারমিতা সাধনের জন্য চিত্তকে সুসংযত করতে হবে। কাম, ক্রোধ, মোহ, শত্রুর আক্রমণ থেকে চিত্তকে সুরক্ষিত করার জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে দুইটি উপায় নির্ধারিত হয়েছে, যথা - স্মৃতি এবং সংপ্রজন্য। আচার্য শান্তিদেব তাঁর *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলেছেন, ''যাঁহারা চিত্তকে রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট আমি কৃতাঞ্জলি'পুটে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা সর্ব প্রযত্নে 'স্মৃতি' ও 'সংপ্রযত্ন'-কে রক্ষা করুন।'' স্মৃতির অর্থ 'বিহিত-প্রতিষিদ্ধয়ো যথা যোগং স্মরণং স্মৃতিঃ' অর্থাৎ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধের স্মরণ। কোন্ কার্য বিহিত হয়েছে এবং কোন্ কার্য নিষিদ্ধ হয়েছে - তা যথাযথভাবে স্মরণে রাখার নামই স্মৃতি। কায় ও চিত্তের অবস্থা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করার নাম 'সংপ্রজন্য'। দেহ কী অবস্থায় আছে এবং চিত্তই বা কী অবস্থায় আছে বারংবার তা পরীক্ষার নামই 'সংপ্রজন্য'। *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে এই লক্ষণই উক্ত হয়েছে। স্মৃতি ও সংপ্রজন্য যুগপৎ সাধনার দ্বারা কায় ও চিত্ত সুসংযত ও সমাহিত হলে যথাভূত দর্শন হয়ে থাকে। পূর্বোক্ত প্রণালী মতে শীল পারমিতার সাধনা দ্বারা যখন চিত্ত পরিশোধিত হয়ে যায় তখনই সর্বজীবের প্রতি যথার্থ মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়।

বস্তুতপক্ষে, সর্বজীবের সতত হিত সুখ সাধন - ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ শীল।

ক্ষান্তি পারমিতা : একজন বোধিসত্ত্বের উচিত ক্ষান্তি পারমিতার অনুশীলন করা। এর সমার্থক শব্দ হল ক্ষমা (forbearance), ধৈর্য্য (patience), নম্রতা (meekness) ইত্যাদি। এর বিপরীত শব্দ হল ক্রোধ (anger), দ্বেষ (hatred), অপমান (malice)। ক্ষান্তি হল রাগ ও আবেগের থেকে

৫। *বোধিচর্যাবতার* , ৫।১১

মুক্তি এবং এটি হল আঘাত ও অপমানের মার্জনাকারী অনুশীলন। এটাই হল ক্ষমার প্রাথমিক ও মৌলিক সংজ্ঞা।[৬]

সংসারে মানবতার পরিপন্থী যত অশুভ শক্তি আছে তাদের মধ্যে ক্রোধ প্রধান। তাই মানবতার সাধককে সর্ব প্রযত্নে ক্ষান্তি বা ক্ষমাশীলতার অনুশীলন করতে হবে। অপরে যতই দুর্ব্যবহার করুক না কেন তার প্রতিহিংসা গ্রহণে বিরত থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, তার বিরুদ্ধে কোনো অসদিচ্ছা বা প্রতিহিংসার ভাবও পোষণ করা যাবে না। তাই হল ক্ষান্তি।

আচার্য শান্তিদেব *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ক্ষান্তি পারমিতার সাধন প্রণালী বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। মানবতার সাধক কীভাবে ক্রোধ, দ্বেষাদি জয় করে মৈত্রীর পথে অগ্রসর হবেন, সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

ন চ দ্বেষসমং পাপং ন চ ক্ষান্তিসমং তপঃ।
তস্মাৎ ক্ষান্তিং প্রযত্নেন ভাবয়েদ্ বিবিধৈর্ণয়ৈঃ।।

অর্থাৎ, দ্বেষের সমান পাপ নেই এবং ক্ষমার সমান তপস্যা নেই। অতেব, পরম যত্নে এবং নানা বিষয়ে ক্ষমার অনুশীলন করবে।

ক্ষান্তি ত্রিবিধ। যথা- (ক) দুঃখাদিবাসনা ক্ষান্তি, (খ) পরাপকার মর্ষণ ক্ষান্তি এবং (গ) ধর্ম নিধ্যান ক্ষান্তি।

৬। Har Dayal , *The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature* , Delhi , Motilal Banarsidass Private Limited , 1932 . pg – 209.

(ক) **দুঃখাদিবাসনা ক্ষান্তি :** যে অবস্থায় অত্যন্ত অনিষ্টের উৎপত্তি হলেও মানসিক অশান্তির উৎপত্তি হয় না - তাই হল দুঃখাদিবাসনা ক্ষান্তি। দৌর্মনস্য বা মানসিক অশান্তির প্রতিপক্ষরূপে যত্নপূর্বক 'মুদিতা' বা মানসিক প্রফুল্লতা অভ্যাস করতে হয়। কারণ- মানসিক প্রফুল্লতা নষ্ট করে দৌর্মনস্য আশ্রয় করলে অভীষ্ট ফল লাভ হয় না, উপরন্তু যা কুশল তাও নষ্ট হবে।

(খ) **পরাপকার মর্ষণ ক্ষান্তি :** অন্যের কৃত অপকার সহ্য করা এবং অপকারীর অনিষ্ট না করা - তাই হল পরাপকার মর্ষণ ক্ষান্তি।

আচার্য শান্তিদেব *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে নির্দেশ করেছেন, যখন কেউ দন্ডাদি নিক্ষেপ করে আমাকে আঘাত করে, আমি ওই দন্ডের প্রতি ক্রুদ্ধ হই না, দন্ডাদি যার দ্বারা প্রেরিত হয় তার ওপর ক্রুদ্ধ হই। মূখ্য দন্ডাদিকে ত্যাগ করে যদি তার প্রেরকের ওপর ক্রুদ্ধ হই, তবে দ্বেষের প্রতিই আমার বিদ্বেষ হওয়া উচিত। কেননা সেই দন্ডাদির প্রেরকও দ্বেষের দ্বারাই প্রেরিত হয়ে থাকে।

(গ) **ধর্ম নিধ্যান ক্ষান্তি :** ধর্ম বা পদার্থের স্বরূপ চিন্তনের দ্বারাও ক্ষান্তি বা ক্ষমাশীলতার অনুশীলন করা যেতে পারে।

ক্ষমাই জীবনের মূলমন্ত্র কারণ জগতের সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক ও নিঃসার, তাই ক্রোধের বিষয়ও ক্ষণিক। মন অমূর্ত, তাই কেউ তাকে আঘাত করতে পারে না। শরীরের আসক্তিবশতঃই মন দেহের দুঃখ নিজের দুঃখ বলে কল্পনা করে। প্রকৃতপক্ষে কর্কশ বাক্য, ধিক্কার ইত্যাদি দেহকে বা মনকে কাউকেই আঘাত করতে পারে না। তাই তাতে দুঃখিত হয়ে শত্রুর অনিষ্ট চাওয়াতে কোনো স্বার্থসিদ্ধি হয় না। এই প্রসঙ্গে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে,

এতদ্ধি বড়িশং ঘোরং ক্লেশ বাড়িশিকা পিতং ।
যতো নরকপালা স্ত্রং ক্রীত্বা পক্ষ্যন্তি কুম্ভিষু ।।[৭] (৬।৮৯)

মনে রেখো - এইরূপ পরানিষ্ট চিন্তনই সেই ভয়ঙ্কর বড়িশ, যা ক্লেশরূপে বাড়িশিক (মৎসশিকারী) তোমাকে গাঁথিবার জন্য বড়িশ ফেলে রেখেছে। তুমি ধরা পড়লে তার থেকে নরক পালগণ তোমাকে ক্রয় করে কুম্ভিপাক নরকে রান্না করবে।

এই চিন্তার দ্বারা মন ক্ষান্তির আশ্রয় গ্রহণ করবে। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন ক্ষান্তির অনুশীলন দ্বারা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবাদ-বিসম্বাদ, শ্রেণী-সংঘর্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রশমিত হয়ে যাবে এবং জগতে শান্তি প্রশমিত হবে। এই কারণে ভগবান তথাগত বলেছিলেন :

''খন্ত্যা ভিয্যো ন বিজ্জতি''[৮] (সংযুক্তনিকায় : ১।১২২)

- জগতে ক্ষান্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই।

বীর্য পারমিতা : পারমিতা হিসাবে বীর্য শব্দটি একটি ব্যাপক বিস্তারসম্পন্ন শব্দ। 'বীর্য' শব্দটি এসেছে 'বীর' শব্দ থেকে, যার অর্থ তেজ, ক্ষমতা, বীরত্ব ইত্যাদি অবস্থাসম্পন্ন এক শক্তিশালী ব্যক্তি।

৭। *বোধিচর্যাবতার* , ৬।৮৯

৮। *সংযুক্তনিকায়* : ১।২২২

বৌদ্ধধর্মে ও দর্শনে 'বীর্য' হল একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

এবং ক্ষমো ভজেদ্ বীর্যং বীর্যে বোধির্যতঃ স্থিতা ।
নহি বীর্যং বিনা পুণ্যং যথা বায়ুং বিনা গতিঃ ।।[৯] (৭।১)

এইভাবে ক্ষমাশীল হয়ে বীর্যের আশ্রয় নিতে হবে। কেননা বীর্যেই বোধি অবস্থান করছে। বায়ু বিনা যেমন গতি অসম্ভব, তেমনি বীর্য বিনা পুণ্যও সম্ভব নয়।

''কিং বীর্যং কুশলোৎসাহঃ''[১০] (৭।২) - বীর্য কাকে বলে? কুশল কর্মে উৎসাহই 'বীর্য' নামে অভিহিত। বীর্যের বিপক্ষ হল আলস্য, কুৎসিত বিষয়ে আসক্তি, বিষাদ বা অনধ্যবসায় এবং নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস। বনচারী সিংহ যেমন গমন, ভ্রমণ ও শয়ন সকল অবস্থাতেই বীর্য প্রদর্শন করে, তেমনি বোধির সাধককেও সর্বদা বীর্য আশ্রয় করে চলতে হবে। বীর্য পারমিতা সাধনার নিমিত্ত নিম্নোক্ত বিধানসমূহ গ্রহণ করতে হবে। যথা - (ক) অবিষাদ, (খ) বল-বূহ্য, (গ) তৎপরতা, (ঘ) আত্মবিধেয়তা।

(ক) **অবিষাদ** : মানবতার সাধনায় সিদ্ধিলাভ অত্যন্ত কঠিন কাজ, এই পথ বড়ই কঠিন ও দুঃখদায়ক। এইরূপ চিন্তা করতে করতে মন অবসন্ন হয়ে যায়। তখন নিমোক্ত ভাবনার সাহায্যে মনের অবষাদ ঝেড়ে ফেলতে হবে -

---

৯। *বোধিচর্যাবতার* , ৭।১

১০। *বোধিচর্যাবতার* , ৭।২

নৈবাবসাদঃ কর্তব্যঃ কুতো মে বোধিরিত্যতঃ ।
যস্মাত্তথাগতঃ সত্যং সত্যবাদীদ মুক্তবান ।।[১১] (বোধিচর্যাবতার ৭।১৭)

অর্থাৎ, আমি দীন, আমার কীরূপে বুদ্ধত্ব লাভ হইবে? এইরূপ চিন্তা করে অবষাদ করা কর্তব্য নয়। তথাগত সত্যবাদী, তিনি যখন বলেছেন যে বীর্য দ্বারা বোধিলাভ হয়, তখন তা অবশ্যই হবে।

(খ) **বল-ব্যূহ :** সাধন সমরে জয়লাভ করতে হলে সাধককে এক চতুরঙ্গিনী বাহিনী গঠন করে তাদের সাহায্যে মানবতার প্রতিদ্বন্দ্বী অশুভ শক্তিসমূহের সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করতে হবে। উক্ত বল-ব্যূহ হল - (১) ছন্দ, (২) স্থাম, (৩) রতি, (৪) মুক্তি।

কুশল অভিলাষকে ছন্দ বলে। অশুভ কর্মে দুঃখ লাব হয় এবং শুভ কর্ম থেকে নানারকম মধুর ফলোৎপন্ন হয়ে থাকে। এই ভাবতে ভাবতে কুশল কর্মে ছন্দ বা অনুরাগের সঞ্চার হয়। আরব্ধ কর্মে যে দৃঢ়তা বা ঐকান্তিক নিষ্ঠা, তাকে স্থাম বলে। এই দৃঢ়তা বৃদ্ধির প্রসঙ্গে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে,

ময়া হি সর্বং জেতব্যমহং জেয়ো ন কেনচিং ।
ময়ৈষ মানো সোঢ়ব্যো জিন সিংহ সুতোহ্যহম্ ।।[১২] (৭।৫৫)

জিন (বুদ্ধ) সিংহের পুত্র আমি। কাম-ক্রোধাদি সকল শত্রুকে আমি জয় করব। আমাকে কেউই জয় করতে পারেবে না। অন্তরে আমাকে এই মান বহন করতে হবে। সৎকার্যে

১১। *বোধিচর্যাবতার* , ৭।১৭

১২। *বোধিচর্যাবতার* , ৭।৫৫

একান্ত অনুরাগকে 'রতি' বলে। চতুর্থ সাধন হল মুক্তি বা ত্যাগ। সামর্থে না থাকলে আরব্ধ কাজকে কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখাকে 'মুক্তি' বলে।

(গ) **তৎপরতা :** সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য সাধককে প্রতি পদক্ষেপে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হবে। তার নাম তৎপরতা বা নিপুণতা। *বোধিচর্যাবতার*-এ উল্লেখ আছে - রাজাজ্ঞায় দন্ডিত ব্যক্তি তৈলপূর্ণ পাত্র হস্তে অসিধারী রাজপুরুষদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বিন্দুমাত্র তৈল পতনে প্রাণ যাইবে - এই ভয়ে যেমন অতি সন্তর্পণে চলতে থাকে, ব্রতধারী সাধককে ঠিক তেমনি সাবধানতার সঙ্গে সাধন পথে চলতে হবে।

(ঘ) **আত্মবিধেয়তা :** আলস্য জড়তাদি দ্বারা যেন সাধনায় শৈথল্য না আসে, কেবল উৎসাহ বশে সাধন পথে যেন অব্যাহত গতি হয় এইভাবে আলস্যাদি দ্বারা যে চিত্তের অবশীভূতভাব, তার নাম আত্মবিধেয়তা বা আত্মবশবর্তীতা। এই প্রসঙ্গে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে,

যথৈব তুলকং বায়োর্গমনা গমনে বশং ।
তথোৎসাহ বশং যায়াদ্ ঋদ্ধিশ্চৈবং সমৃধ্যতি ।।[১৩] (৭।৭৫)

অর্থাৎ, তুলা যেমন বায়ুর বশীভূত হয়ে বায়ুর গতি অনুযায়ী গমনাগমন করে, তুমিও তেমনি উৎসাহ বা বীর্যের বশীভূত হয়ে সাধন পতে এগিয়ে চলো এবং তাতে তোমার সর্ববিধ সিদ্ধিলাভ হবে।

১৩। *বোধিচর্যাবতার* , ৭।৭৫

ধ্যান পারমিতা : ধ্যান বলতে বোঝায় meditation, contemplation ইত্যাদি। *বোধিসত্ত্বভূমি* গ্রন্থে ধ্যান বলতে বলা হয়েছে, 'চিত্ত একাগ্রম্ চিত্তস্থিতি', অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা ও চিত্তেই অবস্থান করাই হল ধ্যান।

বীর্য পারমিতা সাধনার দ্বারা পূর্ণ মানবতা লাভে উৎসাহ বর্ধিত করে সাধককে ধ্যান পারমিতার সাধনায় অগ্রসর হতে হবে। বিক্ষিপ্তচিত্ত মানুষ কখনো কাম-ক্রোধাদি ক্লেশসমূহকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয় না। এজন্য ভগবান তথাগত দুটি সাধনার উপদেশ দিয়েছিলেন - (১) শমথ বা সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা এবং (২) বিপশ্যনা অর্থাৎ সমাধিজ প্রজ্ঞা।

ধ্যান পারমিতার সাধককে সংসারের ভোগ সাখ যে কত তুচ্ছ, ক্ষুদ্র ও কুৎসিত তা বিচার করতে হবে। এই ভোগ সুখের জন্য প্রাণীগণ জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে পরিমাণ পরোশ্রম করে এবং দুঃখ সহ্য করে দতার তুলনায় অল্প পরিশ্রম ও অল্প দুঃখ সহ্য করে তারা বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে। এইভাবে বিচার করে বৈরাগ্য উৎপন্ন হলে সাধক নির্জন স্থানে গমন পূর্বক ধ্যান সাধনায় প্রবৃত্ত হবেন। আচার্য শান্তিদেব তাঁর *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে ধ্যান পারমিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এই পরিচ্ছেদে মানবতার তিনি মানবতার বিকাশের জন্য দুইটি ধ্যানের ওপর সমধধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যথা - (ক) পরাত্ম সমতা ধ্যান অর্থাৎ পরকে ও নিজেকে সমান বা এক বলে ভাবা এবং (খ) পরাত্ম পরিবর্তন ধ্যান অর্থাৎ পরকে নিজে ও নিজেকে পর বলে ভাবা।

আচার্য শান্তিদেব *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে পরাত্ম সমতা ধ্যানের প্রণালী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

পরাত্ম সমতা মাদৌ ভাবয়েদেবমাদরাৎ ।
সম দুঃখ সুখাঃ সর্বে পালনীয়া ময়াত্মবৎ ।।[১৪] (৮।৯০)

অর্থাৎ আমার সুখ বা দুঃখ আমার মনে যে ভাব উৎপন্ন করে, অন্যের সুখ বা দুঃখও তার মনে সেই ভাবই সৃষ্টি করে। অতএব, যখন সুখ-দুঃখ সকলেরই সমান, তখন সকলকেই আমার নিজের ন্যায় পালন করতে হবে। এইভাবে ধ্যানের দ্বারা যখন সাধকের চিত্ত ভাবিত হয়, তখন তিনি অতি সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে পরহিতার্থে যে কোনো দুঃখ বরণ করতে পারেন।

অপরদিকে, পরাত্ম পরিবর্তন ধ্যানের উদ্দেশ্য হল নিজেকে পর বলে মনে করে স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জন করা এবং পরকে আপন বলে গ্রহণ করে পরার্থ সেবায় আত্মনিয়োগ করা। আচার্য শান্তিদেব বলেছেন, যিনি নিজের এবং পরের সত্বর পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁর এই পরম গুহ্য 'পরাত্ম পরিবর্তন ধ্যান' অভ্যাস করা উচিত।

১৪। *বোধিচর্যাবতার* , ৮।৯০

-: তৃতীয় অধ্যায় :-

প্রজ্ঞার স্বরূপ

পূর্বের অধ্যায়ে আমি প্রজ্ঞা ব্যতীত দান, শীলাদি পারমিতার স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ে আমি আমার সন্দর্ভের মূল বিষয় অর্থাৎ প্রজ্ঞা পারমিতা নিয়ে আলোচনা করব। প্রজ্ঞা বিষয়ে আচার্য শান্তিদেব রচিত *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থ অবলম্বন করে প্রজ্ঞার স্বরূপ আলোচনা করার চেষ্টা করব।

বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়, দানাদি পারমিতা অনুশীলন করা সত্ত্বেও তা যদি প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত না হয় তাহলে ব্যক্তির যে চরম লক্ষ্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, তা সম্ভব নয়। কারণ দান, শীল ইত্যাদির দ্বারা ব্যক্তির চরিত্র গঠন হয়ে মন থেকে সমস্ত কলুষতা দূর হয় ঠিকই কিন্তু তার দ্বারা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হয় না। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য সেই শুদ্ধ মনে বস্তুর যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এবং সেই জ্ঞান যা আসে প্রজ্ঞা থেকে। তাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য বা সাংসারিক দুঃখ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে বুদ্ধত্ব লাভ করতে হলে প্রজ্ঞা উৎপাদনের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত।

এই প্রসঙ্গে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে ,

ইমং পরিকরং সর্বং প্রজ্ঞার্থং হি মুনির্জগৌ ।
তস্মাদুৎপাদয়েৎ প্রজ্ঞাং দুঃখনিবৃত্তিকাঙ্ক্ষয়া ।।১।।[১]

১। প্রজ্ঞাকরমতিকৃত *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা* , পৃষ্ঠা - ৩৪৪

অর্থাৎ, মুনি বুদ্ধদেব বলেছেন - এইসব পরিকর বা সাধন সমূহ শুধু প্রজ্ঞালাভের জন্যই। অতএব, দুঃখনিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্ঞার উৎপাদন অবশ্য কর্তব্য।

'ইমং' শব্দের অর্থ এই, পরিকর অর্থাৎ এই সমস্ত দানাদি পারমিতা সাধন সবকিছুই প্রজ্ঞার নিমিত্ত। এই প্রজ্ঞা কিন্তু প্রমাণ নয়, তা হল বুদ্ধত্ব লাভের উপায়। প্রজ্ঞা হল চরম জ্ঞান বা ultimate knowledge যার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব অর্জন করা যায়।

এখন প্রশ্ন হবে, কার প্রজ্ঞার উৎপাদন করা উচিত? ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, যিনি দুঃখের নিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন অর্থাৎ যিনি সংসারের সমস্ত দুঃখ থেকে নিবৃত্তি পেতে চান তাকে দানাদি পারমিতা অনুশীলনের সাথে সাথে প্রজ্ঞার প্রতিও যত্নবান হতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, প্রজ্ঞা কী? - প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে গিয়ে টীকাকার প্রজ্ঞাকরমতি তাঁর *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা* টীকায় বলেছেন, 'প্রজ্ঞা যথাবস্থিতপ্রতীত্যসমুৎপন্নবস্তুতত্ত্বপ্রবিচয়লক্ষণা'[২] অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপন্ন হিসাবে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কের জ্ঞানই হল প্রজ্ঞা। প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলতে বোঝায়, জগতের সমস্ত বস্তুই অন্য এক বস্তু থেকে উৎপন্ন, অর্থাৎ কোন বস্তুই নিরপেক্ষ নয় - অপরের সাপেক্ষেই বস্তুর সত্তা। বস্তুর এই যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কের জ্ঞানই হল প্রজ্ঞা। *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'দানপারমিতাদিষু ধর্মপ্রবিচয়স্বভাবায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ প্রধানত্বাৎ'[৩] অর্থাৎ সমস্ত পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞা হল প্রধান। প্রজ্ঞা হল ধর্মের স্বরূপ।

এই প্রজ্ঞা দুই প্রকার - হেতুভূত ও ফলভূত। হেতুভূত প্রজ্ঞাও দুই প্রকার- অধিমুক্তিচরিত এবং ভূমিপ্রবিষ্ট চরিত। প্রজ্ঞার স্তরের যে ভেদ তার কারণ হল বোধিসত্ত্বের জীবনের অগ্রগতি। বোধিসত্ত্বের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী প্রজ্ঞাকে এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় -

২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪৪

৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪৪

যিনি সবেমাত্র বোধিসত্ত্বের জীবনের প্রথম পর্যায় বা ভূমিতে প্রবেশ করেছেন তার প্রজ্ঞা, অন্যটি হল, যিনি বোধিসত্ত্বের জীবনের অনেকটা পর্যায় অগ্রসর করে ফেলেছেন সেই ব্যক্তির প্রজ্ঞা। অর্থাৎ, বোধিসত্ত্বের জীবনের পর্যায় অনুযায়ী প্রজ্ঞার স্তর নির্ধারিত হয়। যেহেতু প্রজ্ঞার এই ভেদ হেতু থেকে সৃষ্ট তাই তা হেতুভূত। অপরদিকে, ফলভূত প্রজ্ঞা হল যা কোনো ফল থেকে উৎপন্ন নয়। প্রজ্ঞার এই স্তরে ব্যক্তি সমস্ত প্রকার মঙ্গল সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে এবং তা থেকে সর্বধর্মশূণ্যতারূপ স্বভাবের বোধ উৎপন্ন হবে। বোধিসত্ত্ব তার জীবনে শ্রুত, চিন্তা ও ভাবনা - এই ক্রম অনুযায়ী অভ্যাস করার ফলে তার মধ্যে ভূমিপ্রবিষ্ট প্রজ্ঞা উৎপন্ন হবে। অর্থাৎ বোধিসত্ত্বের জীবনের ভূমিতে প্রবেশ করার হেতু হল এই শ্রুত, চিন্তা ও ভাবনার ক্রমিক অভ্যাস। ভূমিপ্রবিষ্ট প্রজ্ঞার দ্বারা বোধিসত্ত্ব এক-একটি ভূমি অতিক্রম করার ফলে বোধিসত্ত্বের জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ঘটবে যার ফলে উভয় প্রকার আবরণ দূর হয়ে যাবে, সকল প্রকার জাতি, কল্পনাজাল মুক্ত হয়ে যাবে। যিনি বুদ্ধ তিনি এই সবকিছুর উর্ধ্বে। প্রজ্ঞার দ্বারা ভূমিপ্রবিষ্ট হলে এই সকল প্রকার আবরণ দূরে সরে গিয়ে মূলতত্ত্ব বা বোধিচিত্ত (বুদ্ধস্বভাব) ফুটে উঠবে। তখন সর্বোচ্চ স্তর অধিমুক্তির স্তরে পৌঁছতে পারা সম্ভব হবে। দুঃখনিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষাবশতঃ এই প্রজ্ঞা প্রয়োজন। প্রজ্ঞার উৎপন্ন হলে বিকল্পজ্ঞান থেকে সৃষ্ট মিথ্যাদৃষ্টির অবসান হবে। ফলে বোধিচিত্তের উৎপত্তি হবে। তখনই দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব হবে।

সংসারে আবদ্ধ ব্যক্তি এবং যাদের আত্মার প্রতি অভিমান আছে তারাই দুঃখ পায়। দুঃখ হল জাতি, ব্যধি, জরামরণস্বভাববিশিষ্ট, প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয়সংযোগ ইত্যাদির পর্যায়ক্রম। সংক্ষেপে বলা যায় দুঃখ হল পঞ্চস্কন্ধ বা উপাদান (রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার) দ্বারা উৎপন্ন ব্যক্তি বা পুদ্গল। নিবৃত্তির অর্থ হল নির্বাণ বা উপশম। উপশমের অর্থ হল পুনরায় যাতে সেই ধর্ম উৎপন্ন হতে না পারে, তার আত্যন্তিক সমুচ্ছেদ। সেই চেষ্টারই আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ হল দুঃখনিবৃত্তি।

প্রজ্ঞার দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি ঘটবে। অবিদ্যার ফলে আমরা যা কিছু অভিজ্ঞতায় পাই সবই সংস্কৃত বস্তু এবং তারা সবই স্বপ্নমায়াদিস্বভাববিশিষ্ট। তাকেই সাধারণ মানুষ আসল বলে মনে করে। বোধিচিত্তের বোধ উৎপন্ন হলে তখনই মানুষ বুঝতে পারবে যে তা স্বপ্নমায়াস্বভাব। স্বপ্ন ছাড়া যেমন স্বপ্নের বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই, তেমনি এই জগত ছাড়া বস্তুগুলিরও কোনো অস্তিত্ব নেই। ফলে সমস্ত ধর্মের নিঃস্বভাবতার প্রতিপত্তি ঘটবে। যখন ব্যক্তি বুঝবে যে সমস্ত বস্তুই নিঃস্বভাব তখন তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা চলে যাবে। ফলে সমস্ত দুঃখেরও উপশম হবে। এইভাবে যুক্তির দ্বারা এবং ভগবান বুদ্ধ উচ্চারিত প্রথম আগমের দ্বারা বিচার করে প্রজ্ঞার অবিপরীত বোধ বা সঠিক বোধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতায় যে সকল বস্তু দেখি, সেগুলোকেও অস্বীকার করতে পারি না। কারণ- আমরা অভিজ্ঞতায় যা দেখি তারা সকলেই সংস্কৃত বস্তু এবং তাদের প্রত্যেকেরই কিছু অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাতে বস্তু যা আর বাস্তবে বস্তু যেভাবে ধরা পড়ে তার মধ্যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। আবার সাধারণ জীবনের সাথে বিরোধমূলক কোনো তত্ত্বকে আমরা প্রমাণ রূপে স্বীকার করতে পারি না। সেক্ষেত্রে প্রজ্ঞা যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান তা স্বীকার করব কীরূপে?

এক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, প্রজ্ঞা বস্তুর যে নিঃস্বভাবতার তত্ত্ব তুলে ধরে তা বাস্তবের বিপরীত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। প্রজ্ঞা যে বাস্তবের অবিপরীত তত্ত্বই তুলে ধরে তা প্রদর্শনের জন্যই বা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রে দুই প্রকার সত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা।

-: চতুর্থ অধ্যায় :-

সংবৃতি ও পারমার্থিক সত্যের পার্থক্য নির্দেশ

প্রথম সূত্রে প্রজ্ঞার স্বরূপ অন্বেষণের পর শান্তিদেব ওই গ্রন্থের দ্বিতীয় সূত্রে সংবৃতি সত্য এবং পরমার্থ সত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। কারণ সংবৃতি সত্য থেকে ভিন্নরূপে পরমার্থ সত্য লাভই হল প্রজ্ঞার মূল বৈশিষ্ট্য। তাই দ্বিতীয় শ্লোকে তিনি স্পষ্টতই বলেন,

সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতং ।
বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতিরুচ্যতে ।।২।।[১]

বৌদ্ধদর্শনে সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য - এই দ্বিবিধ সত্য স্বীকৃত হয়। তত্ত্ব যা, তা বিকল্প বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। তাই বুদ্ধির গোচর বা বিকল্পবুদ্ধিকে সংবৃতি সত্য বলা হয়েছে।

সংবৃতি শব্দটির উৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, সংবৃয়তে অর্থাৎ আবৃয়তে বা যা ঢেকে দেয়। সংবৃতি শব্দের অর্থ হল 'যথাভূতংপরিজ্ঞানং স্বভাবাবরণাদাবৃতপ্রকাশনাৎ চ আনয়তি সংবৃতি'[২] অর্থাৎ সংবৃতি হল তাই, যা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপকে আবৃত করে সেই আবৃতের স্বরূপটাকে বস্তুর স্বরূপ বলে তুলে ধরে। অর্থাৎ, এটা সংবৃতি কারণ তা বস্তুর প্রকৃত রূপকে আবৃত করে আবরিত রূপকে তুলে ধরে। অবিদ্যা, মোহ, বিপর্যাস

১। *বোধিচর্যাবতার* , পৃষ্ঠা - ৩৫২

২। তদেব , পৃষ্ঠা - ৩৫২

ইত্যাদি হল সংবৃতির পর্যায় শব্দ। অবিদ্যা হল- ''অসৎপদার্থস্বরূপারোপিকা স্বভাবদর্শনাবরণাত্মিকা চ সতি সংবৃতিরূপপদ্যতে''[৩] অর্থাৎ, অবিদ্যা বস্তুর প্রকৃত স্বভাবকে আবৃত করে তাতে অসৎ পদার্থের স্বরূপ বা সেই বস্তুতে যা নেই সেই স্বরূপকে আরোপ করে। তাই অবিদ্যা হল সংবৃতি সত্য। এই তত্ত্ব আমরা আর্যশালিস্তম্ভসূত্রে পাই। অপর তত্ত্বে, অবিদ্যা হল অপ্রতিপত্তি (জ্ঞান না হওয়া) বা মিথ্যা প্রতিপত্তি। অবিদ্যা হল যাতে অভূত বিষয় খ্যাপিত হয় এবং যথাভূত বিষয় আবৃত হয়, সেইরকম বিপরীত জ্ঞান (অভূতংখ্যাপয়ত্যর্থং ভূতমাবৃত্যবর্ততে)। অবিদ্যাবহুল বিষয় সাধারণ ব্যক্তির কাছে যা সত্য বলে বোধ হয়, তাই সংবৃতি সত্য। যেমন- কমলারোগ বা জন্ডিস হলে সে অবিদ্যাবশত সবকিছুকে কমলা দেখে। অবিদ্যাবশতঃ আমরা বস্তুর যে স্বরূপ দেখি সেই বোধকে সংবৃতি বলি। কারণ- এই প্রকার সত্য বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ থেকে সাধারণ ব্যক্তিকে আবৃত করে রেখেছে।

চন্দ্রকীর্তির *মধ্যমকাবতারে* পাই, মোহ বস্তু স্বভাবের আবরণ করে বলে মোহ হল সংবৃতি সত্য। মোহ যা সত্য বলে খ্যাত সেই বস্তুতে কৃত্রিম স্বভাব বা যা নেই সেই স্বভাব আরোপ করে। তাই মোহবশতঃ কৃত্রিম স্বভাব আরোপিত সত্যকে সংবৃতি সত্য বলে।[৪]

জগতের দিকে দেখলে বোঝা যাবে, এই সংবৃতি সত্য দুই প্রকার, যথা - তথ্য সংবৃতি এবং মিথ্যা সংবৃতি।

দুষ্ট ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নীল ইত্যাদি বস্তুরূপ সম্পর্কে যে প্রতীতি তাকে বলা হয় তথ্য সংবৃতি এবং এটি লোকত সত্য বলে গৃহীত হয়, কারণ - নীল প্রভৃতি বস্তুর যে বোধ বা প্রতীতি উৎপন্ন হয় তা কোনো বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন না হলেও সাধারণ মানুষ এই নীল ইত্যাদির

৩।তদেব , পৃষ্ঠা - ৩৫২

৪। চন্দ্রকীর্তি , *মধ্যমকাবতার* , ষষ্ঠ অধ্যায় , স্তবক-২৫।

জ্ঞানকে সত্য বলে মনে করেন। কিন্তু যখন আমার মরীচিকা প্রভৃতির স্থলে জলের বোধ হয় অথবা ইন্দ্রিয়ের দৌর্বল্যবশতঃ কোনো বস্তুর প্রতিবিম্বকে সেই বস্তু বলে গৃহীত হয় তখন যে মিথ্যাত্বের বোধ হয় তাকে মিথ্যা সংবৃতি বলে। কিন্তু এই তথ্য সংবৃতি এবং মিথ্যা সংবৃতি উভয়ই সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন আর্যব্যক্তিদের কাছে মিথ্যা কারণ পরমার্থ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উভয়ই অলীক হওয়ায় উভয়ই মিথ্যা।

শ্রেষ্ঠের মধ্যে যা পরম তা হল পরমার্থ। অর্থাৎ, পরমার্থ হল অকৃত্রিম বস্তুর সেই বোধ যা কৃত্রিম নয়। বস্তুর যে রূপের জ্ঞান হলে সমস্ত আবরণ, আবৃতি এবং সেই আবৃতির বাসনাজনিত যে ক্লেশ, তার অবসান ঘটে। এটি হল সর্বধর্মানম নিঃস্বভাবতা অর্থাৎ অকৃত্রিম বস্তুর রূপ হল সমস্ত ধর্মের নিস্বভাবতার বোধ। একে শূণ্যতা, তথতা এবং ভূতকোটি বলা হয়। এর পর্যায় শব্দ হল ধর্মধাতু। যা কিছু প্রতীত্যসমুৎপন্ন অর্থাৎ কোনো কিছু থেকে উৎপন্ন পদার্থ তাদের নিঃস্বভাবতাই হল তাদের পারমার্থিক রূপ এবং সেই অবস্থায় বস্তুর যে সাংবৃত বা আপাতরূপ যা আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় তার যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের আর উপপত্তি হয় না।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, কোন্‌টাকে বস্তুর স্বভাব বলব আর কোন্‌টাকে বস্তুর স্বভাব বলব না - এ প্রসঙ্গে টীকাকার প্রজ্ঞাকরমতি যুক্তি দিয়ে বলেছেন, বস্তুর যে স্বভাব সাধারণ মানুষের কাছে পরিদৃশ্যমানরূপে ধরা পড়ে তাকে তার স্বভাব বলতে পারি না। কারণ - পরবর্তীকালে সেই পরিদৃশ্যমানতা আর অবস্থান করে না। যেমন মরীচিকাস্থলে বালিতে জলের স্বভাব দেখা গেলেও পরবর্তীকালে সেই স্থলে জল পাই না। তাই এটি তার স্বভাব নয়। বস্তুর যা স্বভাব তা কখনো আছে কখনো নেই- এমন হবে না। অর্থাৎ সর্বদা অবিচলিতরূপেই বস্তুতে বর্তমান থাকে। বস্তুর যেটি স্বভাব তা কখনি কোনো অবস্থাতেই ওই বস্তু থেকে নিবৃত্ত হবে না। অন্যথা যদি সেটা নিবৃত্ত হত তাহলে তার স্বভাবতার হানি ঘটায় তাকে নিঃস্বভাব বলতে হয় এবং সেই স্বভাবটা উৎপন্নও হয় না এবং সৎ রূপে অন্য কোনো সামগ্রী থেকে বস্তুতে সঞ্চারিত হতে পারে না অথবা নিরুদ্ধও হতে পারে না। কিন্তু যে স্বভাব হেতু-প্রত্যয়সামগ্রীর ওপর নির্ভর

করে মায়ার মতো উৎপন্ন হয়, তার পরিবর্তন বা বৈকল্যও ঘটে এবং তার বিনাশও ঘটে। যেহেতু স্বভাবটা হেতু-প্রত্যয় সামগ্রীর ওপর নির্ভর করে উৎপন্ন হয় তাই তা পরায়ত্ত হওয়ায় বা অন্যের অধীন হওয়ায় তার নিজস্ব যে স্বরূপ তা প্রতিবিম্বের ন্যায় মিথ্যা হওয়ায় তাকে সৎ বলা যায় না। ঠিক যেমন আয়নায় কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখতে চাইলে সেক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হওয়ার জন্য আয়না (হেতু-প্রত্যয়সামগ্রী) থাকতে হবে এবং সেই আয়নার উপর নির্ভর করেই উৎপন্ন হবে। অর্থাৎ আয়না বিকৃত হলে প্রতিবিম্বও বিকৃত হবে। সেক্ষেত্রে সেই বিকৃতিটা বস্তুর নিজস্ব স্বভাব নয়। তার বৈকল্য হচ্ছে আয়নার বৈকল্যবশতঃ; তাই তাকে আর সৎ বলা যাবে না। তাই হেতু-প্রত্যয়সামগ্রীর উপর নির্ভর করে বস্তুর যে স্বভাব উৎপন্ন হয় তা যথার্থ না হওয়ায় তাকে সৎ বলে অভিহিত করা যায় না।

কোনো চিৎপদার্থ পারমার্থিকভাবে হেতু-প্রত্যয়সামগ্রী থেকে উৎপন্ন হতে পারে না, কারণ- কোনো পদার্থ হেতু-প্রত্যয়সামগ্রীও ওপর নির্ভর করে উৎপন্ন হলে তার যে স্বরূপ তা অপর সামগ্রীজনিত হওয়ায় তা পরায়ত্ত অর্থাৎ অপরের অধীনে উৎপন্ন হওয়ায় তার নিজের স্বরূপ লাভ করতে সক্ষম হয় না। এক্ষেত্রে আপত্তি হতে পারে যে, বৌদ্ধদর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে বলা হয় প্রত্যেক কার্য তার কারণসাপেক্ষ। কারণ থেকেই কার্যের উৎপত্তি হয়। সেক্ষেত্রে কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তি হলে কার্যের স্বরূপ কারণের অধীন হওয়ায় তাও পরায়ত্ত। তাই তার নিজস্ব স্বরূপ বলে কিছু না থাকায় সেও নিঃস্বভাব। এইভাবেই বলা হয় যে, জগতের সকল বস্তুই প্রকৃতপক্ষে নিঃস্বভাব। বস্তুর নিজস্ব স্বভাব বলে কিছুই নেই।

বৌদ্ধগণ মনে করেন সত্য দুই প্রকার। যথা - সংবৃতি সত্য ও পরমার্থ সত্য। সংবৃতি সত্য হল এমন এক সত্য যা বাস্তবের অবিপরীত তত্ত্ব তুলে ধরে অর্থাৎ বস্তু যা তাকে সেইভাবে দেখানোই হল সংবৃতি সত্য। পরমার্থ সত্য হল অপর প্রকারের সত্য। টীকাকার প্রজ্ঞাকরমতি ‘চ’ শব্দের দ্বারা এই দুই প্রকার সত্যকে তুল্যবল বলেছেন। সংবৃতি সত্যের কাজ

হল জগতের অবিপরীত রূপ তুলে ধরা, অপরপক্ষে অবিসংবাদক তত্ত্ব অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরাই পরমার্থ সত্যের কাজ। আর্যব্যক্তি বা মহাপুরুষগণ তত্ত্বকে যেভাবে দেখেন তাই হল পরমার্থ সত্য। এইভাবে দুটি সত্য বিশেষভাবে আলোচনার জন্যই টীকাকার 'চ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

জগতের সমস্ত বস্তুই এই দুটি পদার্থের অন্তর্গত - আধ্যাত্মিক পদার্থ এবং বাহ্যভাব পদার্থ। এই দুই প্রকার পদার্থই সংবৃতি স্বভাব ও পরমার্থ স্বভাব - এই দুই প্রকার স্বভাব নিয়ে উৎপন্ন হয়। যে সকল সাধারণ ব্যক্তির বুদ্ধি ও দৃষ্টি অবিদ্যা নামক তিমিরে আচ্ছন্ন তারা জগতের বস্তুকে যেভাবে দেখছে তা বস্তুর প্রকৃত স্বভাব নয়, তা হল বস্তুর সাংবৃত স্বভাব। কারণ তা মিথ্যাদর্শনের বিষয়। যেহেতু তা মিথ্যাদর্শনের বিষয় তাই তা প্রকৃত বিষয় না হওয়ায় তা স্থায়ী নয়, তা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ অবিদ্যা নামক তিমির জ্ঞানের দ্বারা উন্মোচিত হলে সেই স্বভাবও পরিবর্তন হয়ে যাবে। অপরদিকে, সাধারণ ব্যক্তির দৃষ্টি যে অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, বস্তুর প্রকৃত রূপের জ্ঞানের শলাকা বা কাজল দ্বারা তা দূর করে ব্যক্তি যখন সম্যক জ্ঞান বা সম্যক দৃষ্টি লাভ করবে তখন সে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানবে। বস্তুর এই প্রকৃত স্বভাবই হল পরমার্থ স্বভাব। এই স্বভাব যে সকল ব্যক্তির জ্ঞানের বিষয় হবে তাঁরা হলেন আর্যব্যক্তি বা তত্ত্ববিদ্। আর্যব্যক্তি বা তত্ত্ববিদ্দের সম্যকজ্ঞানের বিষয় হিসাবে যে স্বভাব উপস্থিত হয় তাই পরমার্থ স্বভাব। টীকাকার প্রজ্ঞাকরমতি প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা দুই ধরনের ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছেন - সাধারণ ব্যক্তি ও আর্যব্যক্তি। সাধারণ ব্যক্তি বা পৃথকজন হলেন এমন ব্যক্তি যাদের জ্ঞান অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাদের জ্ঞান হল মিথ্যাদৃষ্টির বিষয়। তাই তা সাংবৃত স্বভাব। অন্যদিকে যাঁর সম্যক জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্বের বোধ হয়েছে সেইরকম আর্যব্যক্তি বা তত্ত্ববিদ্ , তাদের সম্যকদর্শনের বিষয় হিসাবে বস্তুর যে স্বভাব প্রকাশিত হয় তাই হল পরমার্থ স্বভাব।

জগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই এই দুই প্রকার স্বভাব উপস্থিত আছে। যে সমস্ত ব্যক্তির দৃষ্টি মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা আবৃত তাদের দৃষ্টিতে যে স্বভাব ধরা পড়ে তা হল সংবৃতি

স্বভাব। অপরদিকে যে ব্যক্তির দৃষ্টি সম্যক জ্ঞানের বিষয়, তার দৃষ্টিতে বস্তুর যে স্বভাব ধরা পড়ে তা হল পরমার্থ স্বভাব। এক্ষেত্রে আমরা সাধারণভাবে মনে করি, দুটি স্তরের পার্থক্য- সংবৃতি স্তর ও পরমার্থ স্তর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই স্তরের পার্থক্যটা হয় ব্যক্তির দৃষ্টির পার্থক্যের জন্যই। অর্থাৎ ব্যক্তি কোন্ দৃষ্টিতে বস্তুটিকে দেখছে তার উপর। অবিদ্যার দ্বারা আবৃত যে ব্যক্তির দৃষ্টি তার দৃষ্টিতে যে স্বভাব প্রকাশিত হয় তা সংবৃতি স্বভাব। অন্যদিকে যে ব্যক্তির সম্যক দৃষ্টি দ্বারা তত্ত্ব অধিগত হয়েছে, তার দৃষ্টিতে যে স্বভাব প্রকাশিত হয় তা পরমার্থ স্বভাব। এক্ষেত্রে শাস্ত্রবিদ্গণ মনে করেন, এমন নয় যে, যে বস্তুর পরমার্থ স্বভাব আছে তার সংবৃতি স্বভাব নেই। একই বস্তুর মধ্যে উভয় স্বভাবই উপস্থিত থাকে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে, দুটি স্বভাব থাকা সত্ত্বেও তাদের একসঙ্গে দেখা যায় না কেন? উত্তরে বলা যায়, সব ব্যক্তির দৃষ্টি সমান না হওয়া যে ব্যক্তি সম্যক দৃষ্টির অধিকারী তার দৃষ্টিতে বস্তুর পরমার্থ স্বভাব প্রকাশিত হবে, আর যিনি সম্যক দৃষ্টির অধিকারী নন, তার দৃষ্টিতে বস্তুর যে স্বভাব প্রকাশিত হবে তা সংবৃতি স্বভাব।

এই প্রসঙ্গে চন্দ্রকীর্তি রচিত *মধ্যমকাবতারে* পাই, যে স্বভাবটা সম্যকদর্শনের দ্বারা বা মিথ্যাদর্শনের দ্বারা লব্ধ, এই দুই প্রকার দর্শন অনুসারে জগতের সমস্ত পদার্থ রূপ ধারণ করে থাকে। যেটা সম্যক দৃষ্টির বিষয় তাকে তত্ত্ব বলি এবং যেটা মিথ্যাদৃষ্টির বিষয় তাকে সংবৃতি সত্য বলি।[৫]

শাস্ত্রবিদ্গণ দুই প্রকার স্বভাবের মধ্যে পার্থক্য করে বলেছেন যে, পরমার্থ স্বভাব একমাত্র তাঁদের দ্বারাই অধিগত হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে, এই শাস্ত্রবিদ্ কারা? এর উত্তরে টীকাকার প্রজ্ঞাকরমতি বলেন, যে ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধি বা জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে আবরণমুক্ত হয়েছে এবং যিনি বুদ্ধ বা বোধির পথ অনুসরণ করছেন অর্থাৎ বুদ্ধ, আর্যশ্রাবক, প্রত্যেকবুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব- এরা সকলেই হলেন আর্যব্যক্তি বা শাস্ত্রবিদ্। তাঁরা সকলেই বলেন, এই দুটি সত্যই

৫। চন্দ্রকীর্তি , *মধ্যমকাবতার* , ষষ্ঠ অধ্যায় , স্তবক-২৩।

একমাত্র সত্য। এর ব্যতীত অন্য কোনো সত্য নেই। এটা বোঝানোর জন্যই 'চ' শব্দের ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে নাগার্জুন বলেছেন, ভগবান বুদ্ধ যে ধর্ম উপদেশ দিয়েছেন তা এই দুটি সত্যকে অবলম্বন করে- সংবৃতি সত্য এবং পরমার্থ সত্য।

সংবৃতি সত্য এবং পরমার্থ সত্যের মধ্যে পরমার্থ সত্য শ্রেষ্ঠ হলেও এই সংবৃতি সত্যকে অস্বিকার করা যায় না। কারণ নাগার্জুন তাঁর মূলমধ্যমককারিকায় স্পষ্টভাবেই বলেছেন, ''ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থা ন দেশ্যতে'' অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্য বা সংবৃতি সত্যকে অবলম্বন না করে কখনো সাক্ষাৎভাবে বা সরাসরি পারমার্থিক সত্যের উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

আমরা জানি, বৌদ্ধদর্শনে ভগবান বুদ্ধদেব চারটি আর্যসত্যের কথা বলেছেন। সেগুলি হল - দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। সেক্ষেত্রে আপত্তি ওঠে, সত্য দুই প্রকার এরূপ বলার কারণ কী? এই আপত্তিটি যুক্তিসংগত। বৌদ্ধদর্শনে চারটি আর্যসত্যের উল্লেখ করা হয়েছে কারণ - এই আর্যসত্যের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা সাধারণ মানুষের জন্য। প্রকৃতপক্ষে দুটি মূল সত্যকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য চারটি আর্যসত্য ব্যবহার করা হয়েছে। সত্যটা দুটো হলেও সাধারণ মানুষের বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে এই দুই সত্যকে চার প্রকার হিসাবে দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চার প্রকারের যে আর্যসত্য তা এই দুই প্রকার সত্য - সংবৃতি ও পরমার্থ সত্যের অন্তর্ভুক্ত। যেমন - দুঃখ, দুঃখ সমুদয় এবং দুঃখ নিবৃত্তির মার্গরূপ যে তিনটি আর্যসত্য তা সবই সংবৃতি সত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু নিরোধরূপ যে তৃতীয় আর্যসত্য তা পরমার্থ স্বভাব হওয়ায় তাকে পরমার্থ সত্য বলে অভিহিত করলে কোনো মতবিরোধ হয় না।

সংবৃতি সত্য অবিদ্যার দ্বারা প্রদর্শিত হয়ে পদার্থে যে স্বরূপ নেই সেই অভূত পদার্থ স্বরূপকে আরোপ করে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, সংবৃতিকে সত্য বলছি কেন? সংবৃতি তো অবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বস্তুর যে স্বরূপ নেই সেই অভূত স্বরূপ আরোপ করে বস্তুকে নানারূপে তুলে ধরে। যেহেতু, সংবৃতি সত্য বস্তুকে নানারূপে আমাদের কাছে তুলে ধরছে যাদের

কোনোটাই তাদের প্রকৃত স্বরূপ নয়, সেক্ষেত্রে এই সত্যকে কী অর্থে সত্য বলে অভিহিত করা যায়? কারণ সত্য হল তাই যা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরে। তাহলে সংবৃতি সত্যকে সত্য বলে মানার কী প্রয়োজন? এর উত্তরে বলা যায় যে, সংবৃতি সত্যও একপ্রকার সত্য। আপত্তি ওঠে, লোকের অধ্যবসায় বা বিকল্পবুদ্ধি বা চিন্তাধারায় সত্য বলেই কি সংবৃতি সত্য? এক্ষেত্রে বলা হয়, সংবৃতি সত্য বলতে আমরা জাগতিক সত্যকে বুঝি। সাধারণভাবে এই ব্যবহারিক সত্যকে সংবৃতি সত্য বলি। সাধারণ মানুষ বা পৃথক্‌জন যারা তত্ত্বকে জানতে চান না তাদের কাছে সত্য বলে যা আবির্ভূত হয় তাকেই ভগবান বুদ্ধ সংবৃতি সত্য বলেছেন।তাই এই লোকসংবৃতি সত্য আমাদের শাস্ত্রে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। তবে, প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক সত্যই একমাত্র সত্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ বা যারা তত্ত্বার্থীভি নয় তারা জগতকে যেভাবে দেখছে তাকেই সত্য বলছে তাই তা লোকসংবৃতি বলে অভিহিত করা হয়।

তাই ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, হে ভিক্ষুগণ, পরমসত্য একটাই। যার মধ্যে কোনো প্রমোষ বা দোষ নেই, তা-ই নির্বাণ এবং এই সকল সংস্কার সবই মৃষা বা মিথ্যা, তা সবই মিথ্যাধর্ম। তাই বলা হয়েছে যা কিছু প্রমোষ ধর্মযুক্ত অর্থাৎ এই মিথ্যাজ্ঞানই হল সমস্ত কিছুর বীজ বা উৎপত্তির কারণ। এরপর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, দুই রকম সত্যে কথা আমরা বলছি কিভাবে? অবিদ্যার দ্বারা যাদের চিত্ত আবিষ্ট হয়ে আছে তাদের চিত্তে বস্তুর যে স্বভাব প্রদর্শিত হয় তা-ই সংবৃতি সত্য নামে পরিচিত। কিন্তু পরমার্থ সত্যকে তো আমরা জানতে পারি না। আমরা কেউ-ই জানতে পারি না যে, পরমার্থ সত্যের স্বরূপ কী, তার লক্ষণ কী? তাই বলা হয় পারমার্থিক দিক থেকে তত্ত্ব হল বুদ্ধির আগোচর।

সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, বুদ্ধি শব্দের অর্থ কী? উত্তরে বলা যায়, বুদ্ধির অর্থ হল সমস্ত প্রকার জ্ঞান। যত প্রকার জ্ঞান মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব সেই সমস্ত জ্ঞানের বিষয়ের অগোচর এই পরমতত্ত্ব। কোনো প্রকারেই এই পরমতত্ত্বকে আমরা আমাদের জ্ঞানের বিষয় করতে পারি না। তাই কীভাবে এই পরমার্থ সত্যের স্বরূপ প্রতিপাদন করতে পারব? এই পরমার্থ সত্য

সকল প্রকার প্রপঞ্চ বা মিথ্যাজ্ঞান, সকল প্রকার অবিদ্যা বিনির্মুক্ত স্বভাব। যেহেতু এই পরমতত্ত্ব সমস্ত প্রকার উপাধিশূণ্য, তাই কীভাবে কোনো বিকল্পবুদ্ধির দ্বারা এই পরমতত্ত্বের চিন্তা করা সম্ভব হবে? অর্থাৎ যেহেতু তা বিকল্পবুদ্ধিগম্য নয় তাই তা কোনোভাবে আমাদের শব্দ প্রয়োগের বিষয় হতে পারে না। যেহেতু আমাদের শব্দ বা ভাষা বিকল্পবুদ্ধি থেকে উদ্ভূত এবং বিকল্পবুদ্ধি বিষয়ের দ্বারা প্রবর্তিত হয় সেইকারণেই সকল প্রকার বিকল্পবুদ্ধি এবং অভিলাপ বা শব্দপ্রয়োগ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ায় এই পরম সত্য অনারোপিত, অসাংবৃত, অনভিলাপ্য (ভাষার দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়)। প্রশ্ন ওঠে, এই পরমতত্ত্বের প্রতিপাদন কেমনভাবে সম্ভব? স্বভাবিকভাবে বক্তব্য এই যে, এই পরমতত্ত্বের প্রতিপাদন করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের অনুগ্রহের নিমিত্ত বিকল্পবুদ্ধিকে অবলম্বন করে সাংবৃত বস্তুকে নিদর্শন হিসাবে তুলে ধরে তার ভিত্তিতে সেই পরম সত্য সম্বন্ধে কিছু বলা হয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিমির রোগের প্রভাববশতঃ তৈমিরিক ব্যক্তি সমস্ত আকাশ দেশে কেশ ভাসতে দেখে। চোখের সমস্যা থাকার জন্যইবস্তুকে সে সেইভাবে সবসময় দেখে, কিন্তু তাতে তার দৈনন্দিন কাজে সমস্যা হয় না এবং সেই তৈমিরিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি এটাও উপলব্ধি করতে পারে না যে সে যেটা দেখছে সেটা ভুল। তার নিকটে যখন কোনো অতৈমিরিক ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি তিমির নামক রোগগ্রস্ত নন, উপস্থিত হয় এবং তৈমিরিক ব্যক্তি যদি নিজের অভিপ্রায় তার কাছে প্রকাশ করে বলেন যে তিনি কেশ পর্যবেক্ষণ করছেন তবে সেই অতৈমিরিক ব্যক্তি বুঝতে সক্ষম হবেন যে তিমির রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বিকল্পবুদ্ধি হয়েছে। তখন তিনি সেই ব্যক্তির বিকল্পবুদ্ধি দূর করার জন্য তাকে সেই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব দেবে যে সেখানে কোনো কেশ নেই। যদি তৈমিরিক ব্যক্তি অতৈমিরিক ব্যক্তির নিকট তার অভিপ্রায় প্রকাশ না করত তাহলে অতৈমিরিক ব্যক্তির পক্ষে জানা সম্ভব হত না ঝে সে যেটা দেখছে সেটা ভুল। কারণ তৈমিরিক ব্যক্তির তাতে দৈনন্দিন কাজে কোনো সমস্যা হচ্ছিল না। তবে, অতৈমিরিক ব্যক্তি যখন তাকে তার ভুলটা জানালেন এবং বললেন, সেখানে কোনো কেশ নেই- এটা বলার দ্বারা

তৈমিরিক ব্যক্তির কাছে এটা প্রতিপাদিত হল যে সেখানে কেশ নেই কিন্তু তার দ্বারা তৈমিরিক ব্যক্তির কেশ দর্শন দূরীভূত হল না।

এইভাবেই তৈমিরিক ব্যক্তি যে কেশটা দেখছে সেটা বাস্তব নয়, তা হল আরোপিত, ঠিক সেরকম আমরা সাধারণ মানুষ যারা তিমির রোগরূপ অবিদ্যার দ্বারা চালিত হয়ে যা প্রকৃত তত্ত্ব তা না দেখে ধাতু, আয়তন, স্কন্ধ বিশিষ্টরূপে বস্তুকে জানছি, সেই অবিদ্যাবশতঃ জ্ঞানকে সংবৃত বলি। বস্তুকে স্কন্ধ, ধাতু ইত্যাদি বিশিষ্টরূপে জানলে বস্তুর প্রকৃত ক্ষণিক স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকলে সেই বস্তু লাভের জন্য বাসনা জন্মাবে। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানতে পারেন একমাত্র ভগবান বুদ্ধ। উদাহরণে যেমন অতৈমিরিক ব্যক্তি তৈমিরিক ব্যক্তির ভুলটা ধরতে পারে, ঠিক সেইরকমই ভগবান বুদ্ধ যখন ব্যক্তিকে বস্তুর প্রকৃত স্বভাব তুলে ধরছে তখন তাকেই বলি পরমার্থ সত্য।

তাই *মধ্যমকাবতারে* শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলেন, তিমির প্রভাববশতঃ কেশাদি সমন্বিতরূপে তার যে বোধ হয়, তার দ্বারাই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞানলাভ হবে।[৬]

পারমার্থিকভাবে সমস্ত বস্তুই স্বলক্ষণ, নিঃস্বভাব, নির্বিকল্পক হওয়ায় তা সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তাই তা অবাচ্য। পারমার্থিক দৃষ্টি থেকে পরমার্থ তত্ত্ব বা অবাচ্য হলেও দৃষ্টান্ত সহযোগে সংবৃতি সত্যের মাধ্যমে বোঝানো হয়, অর্থাৎ সংবৃতিরূপ দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করে পারমার্থিকরূপ সত্যকে বোঝানো হয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে, পারমার্থিকরূপকে অন্যের কাছে তুলে ধরার জন্য সংবৃতি দৃষ্টান্তের সাহায্যের প্রয়োজন হয় কেন? উত্তরে বলা যায়, পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বস্তু নিঃস্বভাব হওয়ায় তার মধ্যে কোনো বিকল্প ইত্যাদি না থাকায়

৬। চন্দ্রকীর্তি , *মধ্যমকাবতার* , ষষ্ঠ অধ্যায় , স্তবক-২৯।

বস্তুর স্বরূপ ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। বস্তুর প্রকৃত স্বভাব সমস্ত প্রকার বিকল্পশূণ্যতা। তাই বিকল্প না থাকলে বস্তুকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই সংবৃতি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়।

তাই বলা হয়, যে ধর্ম অবাচ্য, অনক্ষর সেই ধর্মবিষয়ক বাক্যই বা কী? কোন্ শব্দের দ্বারাই বা উপদেশ দেবে? অনক্ষর বস্তুরও অর্থ আমরা বুঝতে পারি এবং সেই বিষয়ে উপদেশও দিতে পারি তার উপর কোনো কিছু আরোপ করে। যেমন- যেখানে কেশ নেই সেখানে তিমির রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কেশ আরোপ করে বলছে সেখানে কেশ আছে। তেমনি পরমার্থতঃ বস্তুতে কোনো স্বভাব নেই, কোনো ধর্ম নেই, তাতে আমরা স্বভাব আরোপ করে বস্তু সেই সদৃশ বলে দেখানোর চেষ্টা করি।

এক্ষেত্রে ব্যবহারিক সত্যকে অবলম্বন করেই পরমার্থের দেশনা হচ্ছে। পারমার্থিক তত্ত্বের দেশনার জন্যই ব্যবহারিক সত্যের প্রয়োজন। বুদ্ধ উপদেশ এবং বুদ্ধ বাক্য পারমার্থিক হয়। আমরা বলতে পারি, ব্যবহারিক সত্য হল পরমার্থ সত্যের উপায়স্বরূপ।

মূলমধ্যমকশাস্ত্রে বলা হয়, ব্যবহারিক সত্যকে আশ্রয় না করে পরমার্থের দেশনা সম্ভব নয়। পরমার্থের বোধ না হলে নির্বাণ লাভও সম্ভব নয়।

তাই নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য পরমার্থ সত্যের পাশাপাশি ব্যবহারিক সত্যের জ্ঞানও প্রয়োজনীয়। সংবৃতি সত্য ও পারমার্থিক সত্য -দুয়ের মধ্যে বিভাজন থাকা সত্ত্বেও পরমার্থ সত্য ultimate হলেও ব্যবহারিক সত্য না থাকলে পরমার্থ সত্যের অবগতি বা জ্ঞান হবে না। তাই ব্যবহারিক সত্যকে ভ্রান্ত বলে তাকে বর্জন করা সম্ভব নয়। তাও আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

-: উপসংহার :-

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বোধিলাভের উপায়স্বরূপ পারমিতার আলোচনা করা হয়েছে। যেহেতু আমার সন্দর্ভের মূল বিষয় প্রজ্ঞা পারমিতা, তাই অন্যান্য পারমিতার আলোচনার সাথে সাথে প্রজ্ঞা পারমিতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রজ্ঞার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় এই প্রজ্ঞাকে কেন শ্রেষ্ঠ পারমিতা বলা হয়েছে, এই অধ্যায়ে সেই প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, প্রজ্ঞাই যদি প্রধান হয় তাহলে অন্য পারমিতা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কী? এর উত্তরে প্রজ্ঞাকরমতি বলেছেন, দান হল বোধিপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বা পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম ধাপ। এর মাধ্যমে পুণ্য অর্জন করা যায়। তারপর আসে শীল পারমিতা। শীল শব্দের অর্থ চরিত্র। দানের সঙ্গে যখন শীল যুক্ত হয় তখন দানের পাশাপাশি সে চরিত্র গঠন করে অর্থাৎ তা সুখ ভোগের উপকরণ হয়। তারপর আসে ক্ষান্তি পারমিতা বা ক্ষমা। সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হয় একমাত্র ক্রোধের কারণে। তাই এই ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ক্ষমার অনুশীলন করা প্রয়োজন। এর দ্বারাই ব্যক্তি বোধিলাভের পথে এগিয়ে যাবে। এই দান, শীল, ক্ষান্তি - তিনটি সঠিকভাবে অনুশীলন করলে যে পুণ্য অর্জন হয় তা থেকে আসবে ধ্যান। বুদ্ধত্ব লাভ করতে হলে আমাদের পুণ্যসম্ভারের পাশাপাশি জ্ঞানসম্ভার অর্জন করাও প্রয়োজন। ধ্যান থেকে জ্ঞান আসে। ধ্যান পারমিতা থেকে উৎপন্ন যে জ্ঞানসম্ভার তা বীর্যকে ছাড়া সম্ভব হয় না। বীর্য বলতে এখানে তেজ বা সাহসকে বোঝানো হয়েছে। এই পুণ্যসম্ভার ও জ্ঞানসম্ভার - উভয়ই কারণস্বরূপ চিত্তের সমস্ত কলুষতা দূর করে চিত্তকে সমাহিত করতে পারে। চিত্ত যখন কলুষতা মুক্ত হয় তখন তা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ক চিন্তার উপযোগী হয়। তাই অষ্টাঙ্গিক মার্গেও শীলের পরে আসে

সমাধি। তারপর আসে প্রজ্ঞা। তাই এই পাঁচটি পারমিতার সাহায্যে ব্যক্তি প্রজ্ঞার স্তরে পৌঁছতে পারবে।

এই দানাদি পারমিতার অনুশীলন করে যদি প্রজ্ঞার অনুশীলন না করা হয় তাহলে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। অর্থাৎ প্রজ্ঞাকে বাদ দিয়ে বাকী পাঁচটি পারমিতা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির হেতু হতে পারে না। এমনকী এই পাঁচটি গুণকে পারমিতা নামে অভিহিতও করতে পারব না যদি না প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত হলে তবেই তা পরিশুদ্ধ হবে। তবেই আমরা নির্বাণ অবস্থা, যেখানে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয়, সেই অনুকুল অবস্থায় উপনীত হতে পারব। তখনই তা পারমিতা নামের যোগ্য হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, দাতা, দেয়, প্রতিগ্রাহকের অনুপস্থিতি থাকলেও কেউ যদি শুদ্ধ মনে নিরন্তর দীর্ঘকাল ধরে অভ্যাসবশতঃ প্রজ্ঞার অনুশীলন করেন তাহলে তিনি বোধিপ্রাপ্তির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারবে। কারণ- অবিদ্যাবশতঃ আমাদের যে বিকল্পজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান আছে, সেই ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ দূর হয় এবং উভয় প্রকার নৈরাত্ম্যে (পুদ্গল নৈরাত্ম্য ও স্বভাব নৈরাত্ম্য) মিথ্যাজ্ঞান দূর হয়ে মন বস্তুর প্রকৃত যে স্বভাব তা গ্রহণে উপযুক্ত হয়। তখন তিনি নিজের, পরের, পরহিতের মঙ্গলের আধারস্বরূপ পরমার্থ তত্ত্বের উপলব্ধি করতে পারবে, তাই তার মধ্যে তখন প্রজ্ঞাটাই প্রধান হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু প্রজ্ঞা আসলেই সেই সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছনো সম্ভব হয়, তাই দানাদি গুণ গুলির মধ্যে প্রজ্ঞাকেই প্রধান গুণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এক্ষেত্রে মনে হতে পারে, প্রজ্ঞা ছাড়া বাকী পারমিতার কোনো গুরুত্ব নেই, সব গুরুত্ব প্রজ্ঞারই। কিন্তু একথা বলা হয়নি। কারণ- এই সম্যক সম্বোধি লাভ করতে হলে প্রজ্ঞায় পৌঁছতে হলে দান, শীল ইত্যাদি পালন করতে হবে। এগুলিকে বাদ দিয়ে প্রজ্ঞার স্তরে পৌঁছনো

সম্ভব নয়। কেবলমাত্র প্রজ্ঞার দ্বারা সম্যক সম্বোধিতে পৌঁছনো যায় না। তাই প্রজ্ঞার নিমিত্ত দানাদি পারমিতার পরিকর বা সাধন প্রয়োজন।

টীকাকার প্রজ্ঞাকরমতি তাঁর গ্রন্থে কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করেছেন। ব্যক্তি যেমন চন্দ্রমন্ডল, সূর্যমন্ডল ছাড়া কাজ করতে পারে না, তেমনি দান, শীল ইত্যাদি পঞ্চ পারমিতা আছে বলেই প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারে। একইভাবে প্রজ্ঞা পারমিতা ছাড়া পঞ্চপারমিতা পারমিতা নামেও পরিচিত হতে পারবে না। যেমন- রাজা রাজ চক্রবর্তীর যতই সৈন্য, ঐশ্বর্য থাকুক না কেন যদি তিনি সঠিকভাবে রাজ্য পরিচালনা না করতেন তাহলে তাকে কেউ রাজ চক্রবর্তী বলে মনে রাখতেন না। কারণ- ইতিহাসে অনেক রাজাই এসেছেন, কিন্তু তাঁকে মনে রাখা হয়েছে তার কাজের জন্যই। সেইরকম দান, শীল ইত্যাদি পারমিতারও মূল্য আছে যখন তারা প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত হয় বা প্রজ্ঞা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঠিক যেমন গঙ্গা হল বড় নদী, অন্যান্য ছোট ছোট উপনদী তার সাথে এসে মিশে তবেই তারা সাগরে পতিত হয়ে পারে। যদি গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত না হতো তাহলে তারা সাগরে মিশতে পারত না। তেমনি দানাদি পারমিতা প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত হয়েই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। পঞ্চ পারমিতার কথা বলা হলেও সেই পারমিতাগুলি তখনই সার্থক হয় যখন তারা প্রজ্ঞার সঙ্গে যুক্ত হয়। এখানেই অন্যান্য পারমিতার তুলনায় প্রজ্ঞার পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব উভয়ই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ *মিলিন্দপ্রশ্ন* । এই গ্রন্থে রাজা মিলিন্দ এবং মহা পন্ডিত নাগসেনের প্রশ্নোত্তরের সময়ে প্রথম বর্গে লক্ষণ প্রশ্নে প্রজ্ঞার স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে রাজা মিলিন্দ পন্ডিত নাগসেনের কাছে প্রজ্ঞার স্বরূপ জানতে চাইলে তিনি বলেন ছেদন এবং প্রকাশন হল প্রজ্ঞার লক্ষণ। ব্যক্তির মনস্কার দ্বারা বিবেচনা করে প্রজ্ঞার দ্বারা ক্লেশরাশি ছেদন করে। অন্যদিকে, প্রজ্ঞাকে প্রকাশন বলার কারণ হল- কোনো ব্যক্তি যেমন অন্ধকার ঘরে প্রদীপ প্রবেশ করালে সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বিদূরিত হয়, আলো বিকীর্ণ হয়, দ্রব্যসমূহ প্রকাশিত হয় ঠিক সেইরকম প্রজ্ঞা উৎপন্ন হলে অবিদ্যারূপ অন্ধকার

বিদূরিত হয়, বিদ্যারূপী আলো উদ্ভাসিত হয়, জ্ঞানালোক সময়ে বিকিরণ করে, চারি আর্যসত্য প্রকটিত হয়। তখন যোগী 'অনিত্য', 'দুঃখ' ও 'অনাত্মা' প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যক্‌রূপে দর্শন করে।

লক্ষণ প্রশ্নের দ্বিতীয় বর্গে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা একই বস্তু। প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বিষয়ের প্রতি মোহ নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু প্রজ্ঞা দ্বারা 'সর্ব দ্রব্য দুঃখময় এবং সর্ব ধর্ম অনাত্মরূপ'-যে বিবেক অর্জিত হয় তা বিনষ্ট হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, কোনো বৈদ্য পাঁচ প্রকার শিকড় সংগ্রহ করে তা পিষে ঔষধ প্রস্তুত করে রোগীকে তা সেবন করিয়ে আরোগ্য লাভ করায়। রোগী সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর বৈদ্য আর ঔষধ প্রস্তুত করে না। ঠিক সেরকম, পঞ্চশিকড়ের মতো পঞ্চেন্দ্রিয়কে বুঝতে হবে এবং রোগের মতো ক্লেশসমূহকে জানতে হবে। পঞ্চমূল ভৈষজ্য দ্বারা যেমন রোগ নিরাময় হয় তেমনি পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা ক্লেশসমূহ বিনষ্ট হয়। সেই বিনষ্ট ক্লেশ আর উৎপন্ন হতে পারে না। সেইরকম প্রজ্ঞা স্বকৃত্য সম্পন্ন করে নিরুদ্ধ হয়।

অনুমান প্রশ্নে, প্রজ্ঞারত্ন কি? - এই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রজ্ঞা দ্বারা আর্যশ্রাবক 'ইহা পুণ্য', ইহা পাপ'; 'ইহা দোষ', 'ইহা নির্দোষ'; ' ইহা করার যোগ্য', 'ইহা করার অযোগ্য'; 'ইহা হীন', 'ইহা শ্রেষ্ঠ' - ইত্যাদি যথাভূতভাবে জানতে পারেন। 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখের কারণ', 'ইহা দুঃখ-নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়' - তা সবই যথাযথরূপে জানতে পারেন। তাই হল ভগবানের প্রজ্ঞারত্ন।

মহাযান দর্শনে এবং সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ দর্শনে এই প্রজ্ঞার এত গুরুত্ব কেন - তার অনুসন্ধান করতে গেলে দেখতে হবে যে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মুক্তির ধারণা যেভাবে অস্তিত্বশীল ছিল তার পরিবর্তনের জন্যই এই প্রজ্ঞার ধারণার অবতারণা করা হয়েছে।

গৌতম বুদ্ধের সময়ে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী ও আভিজাত্যপূর্ণ মানুষেরা সংসারের নারকীয় দৃষ্টি (infernal vision) দ্বারা পীড়িত ছিল। তাদের আর্যপূর্বসূরীগণ জন্ম-মৃত্যুর সম্বন্ধে এক আশাবাদি (optimist view) মতবাদের প্রচার শুরু করেন। এই মতানুযায়ী, মৃত্যুর পরে ব্যক্তি যমের স্বর্গে (paradise) জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে স্বর্গীয় সুখ লাভ করেন। এমনকী ভারতে তারা এও প্রচার করেন যে, যমের স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেও ব্যক্তি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুনরায় কোনো স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে মানুষ ক্রমশঃ পরিভ্রমণ করতে থাকে। আর্যচিন্তাধারার এই নতুন ধারণার উন্মেষ চেতনায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। এটি ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যখন ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এই সংসারচক্রের সমস্যার সমাধান ধর্ম ও দর্শনের মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। বুদ্ধের সমসাময়িক চিন্তাবিদ্‌গণের মধ্যে অনেকে জড়বাদী ও সুখবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সংসারের এই রূঢ় সত্যকে অস্বীকার করেছিলেন কিন্তু এই অস্বীকৃতি নিজেই প্রকাশ করে যে এই সংসারের সমস্যা তাদের (সেই চিন্তাবিদ্‌গণের) কাছেও মুখ্য বিষয় ছিল। সমসাময়িক বহু চিন্তাবিদ্‌গণ এই সংসারচক্রের সমস্যার সমাধান যোগসাধনা এবং তপস্যার মাধ্যমে করতে উদ্যোগী হন। উচ্চবংশীয় ধনী সন্তানেরা অনেকেই সুখ ও সম্পদের নিরর্থক বাসনা অনুভব করেন এবং তারা পরজন্মে তাদের দুঃখের কারণ পরিদর্শন করে। এই দুঃখ-যন্ত্রণালাভের ভয়ে তারা তাদের পরিবার, গৃহ ত্যাগ করে শ্রমণরূপে বিচরণ করেন এবং তারা কৌমার্য, কঠোরতা ও ধ্যানে নিজেদের নিয়োজিত করেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন রাজা সিদ্ধার্থ।

সংসারের এই ভয়ঙ্কর ফলাফল পুনর্জন্মের তত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায়, যা বৌদ্ধদর্শনে কার্যকরী হয়। ইহ জীবনের পাপ-পুণ্য কর্মের মধ্যে দিয়েই পরজন্মে সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে একজনের পুনর্জন্ম ঘটে। এই প্রক্রিয়ার কোনো বিরাম নেই। কর্মের নিয়মে মৃত্যু ছয়টি নিয়তিতে বিচরণ করে - নরকের অধিবাসী, ক্ষুধার্ত প্রেতাত্মা, পশু, দানব, মানুষ এবং ঈশ্বর। এমনকী কেউ যদি ভালো কর্ম করে তাহলে সে সেই কর্মের ফলস্বরূপ ঈশ্বরের স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। আবার যদি কেউ নিজেকে আত্মসুখ ও অলসতার মধ্যে নিমজ্জিত করে

তাহলে সে নরকে বা অন্য দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বর মানুষের তুলনায় অতিরিক্ত সৌভাগ্যের অধিকারী কারণ তিনি সংসার চক্র অতিক্রান্ত করে ফেলেছেন। যদিও বৌদ্ধধর্মে এইরকম রক্ষাকর্তাস্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। অতএব, সংসারচক্রের ধারণা জীবন-মৃত্যুর এক অন্ধকার নিরাশামূলক দৃষ্টিভঙ্গির বার্তা দেয় যেখান থেকে পলায়নের কোনো পথ নেই।

এক্ষেত্রে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, প্রথমতঃ, সংসারচক্র থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। এই সংসারে সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ভাল কর্মের ফলস্বরূপ সুখদর্শন এবং মন্দ কর্মের ফলস্বরূপ দুঃখদর্শন করবে। কর্মের ফল সর্বদা কর্মকর্তার উপর নির্ভরশীল হয়, তার পরিবারের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু অনেকসময় ভাল কর্ম কিছুক্ষণের জন্য সুখের বার্তা বহন করে আনে, তবুও তারা জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি পায় না। এইভাবে ভারতীয়রা ঈশ্বরের ওপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস না করে সর্বদা সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে যোগসাধনার পথ অবলম্বন করে, যা বৌদ্ধদর্শনে ''প্রতীত্যসমুৎপাদ'' নীতির দ্বারা সমর্থিত।

দ্বিতীয়তঃ, সংসারচক্রের এই মায়াজাল জগৎ সম্পর্কে এমন এক বার্তা বহন করে আনে যা নিছক একটি নিষ্ক্রিয় আনুমান নয়। সনাতন ভারতীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী, সংসার হল জীবনের একটি চরম সত্য এবং সমস্ত দুঃখ দুর্দশার মূল উৎস। বৌদ্ধমতে, গৌতম বুদ্ধের প্রথম শিষ্য যশের কাহিনীর মধ্য দিয়ে এর বর্ণনা পাই। যশ একজন ধনী পরিবারের সন্তান হওয়ায় অধিক সুখের অধিকারী। তিনি হঠাৎ একদিন এক অনুষ্ঠানের পর মধ্যরাত্রে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন তার চারিদিকে অনেক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ শায়িত রয়েছে এবং তারা যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, চারিদিকে বাদ্যযন্ত্র, খাবার ছড়ানো রয়েছে। এই দৃশ্য দেখে তিনি ভীত হন এবং নিজের পরবর্তী জীবনের কথা স্মরণ করে কাঁদতে কাঁদতে গৃহত্যাগ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। পরবর্তীকালে হীনযানী দার্শনিকগণ অভিধর্ম দর্শনে সমসাময়িক ভ্রূণতত্ত্ব (embryology) ধারণার মধ্য দিয়ে বুদ্ধের দ্বাদশনিদান চক্র যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের

জীবনের কর্মচক্রের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেই বিষয়ে সকলকে আবগত করেন। সংসার শুধুমাত্র জীবনের একটি প্রতীক নয়, সনাতন চিন্তাধারা অনুযায়ী তা হল জীবনের একটি অন্ধকারময় দিক।

মানুষের জীবনের এই গভীর নিস্তেজতা যা গৌতম বুদ্ধের পূর্বে, বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক পর্যায় এবং বিভিন্ন হীনযান সম্প্রদায়ের দর্শনের মধ্য দিয়ে উদ্ভব হয় হঠাৎই মহাযান শাস্ত্রে আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে তার বিলুপ্তি ঘটে। এই শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে জগৎ আলো, শুদ্ধতা এবং আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। *অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞা-পারমিতা-সূত্রে* (অধ্যায়-৩) বলা হয়েছে, ভাল পরিবারের একজন পুত্র বা কন্যা যিনি প্রজ্ঞা পারমিতা লাভ করতে চান, তার দৈহিক বা মানসিক কোনো যন্ত্রণা থাকে না। তার ইচ্ছা অনিযায়ী সে শয়ন করে, পরিভ্রমণ করে। তার দেহ সর্বদা শক্তি, অনুভব ও আলোয় পূর্ণ থাকে। যখন সে নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে তখন সে কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখে না এবং যদি সে কিছু দেখে তাহলে তার দৃষ্টিতে আসে বোধিসত্ত্ব, স্তূপ, তথাগত ইত্যাদি। *প্রজ্ঞা-পারমিতা-সূত্রে* প্রজ্ঞা পারমিতাকে উজ্জ্বলরূপে ও শুদ্ধরূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি প্রজ্ঞা পারমিতার মন্ত্রে বিশ্বাস করেন তাহলে তিনি জগতের সকল বন্ধন ও দুঃখ বিপর্যয় থেকে মুক্তিলাভ করেন।

প্রজ্ঞা-পারমিতা-সূত্রে উল্লেখিত হয়েছে, জন্ম-মৃত্যুর চক্র বা মৃত্যুর পরে অন্য দেহ ধারণ অবাস্তব। সেটি ভ্রম বা স্বপ্ন ব্যতীত কিছুই নয় এবং তাই মৃত্যুর পরে অন্য একটি দেহ ধারণ বা সেই দেহ থেকে চিরতরে মুক্তিলাভও বাস্তব নয়। যদি সংসারের অস্তিত্ব না থাকে তাহলে নির্বাণ- যা দ্বারা সংসারের বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া যায়, তারও অস্তিত্ব নেই। এই দুটি এক, অবিভাজ্য এবং অবিভেদ্য। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতকে মাধ্যমিক দর্শনের রূপকার নাগার্জুন প্রজ্ঞাপারমিতা সম্পর্কে তাঁর *মধ্যমককারিকা* গ্রন্থের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে বলেছেন, নির্বাণ থেকে সংসারকে পৃথক করা যায় না। যদি এই দুটি অবিভেদ্য হয় তাহলে নির্বাণের পরিসীমাই হল সংসারের পরিসীমা। এদের মধ্যে কিছুমাত্রও বিভেদ নেই। যেমন - বাস্তব থেকে ভ্রমের পরিবর্তন

এবং সেই ভ্রমেরই নির্ধারণ হয় বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে সেইরকমই সংসারও নির্বাণে পরিপূর্ণতা পায় এবং সেই নির্বাণ সুনির্ধারিত হয় সংসার দ্বারা।

প্রাচীন বৌদ্ধসূত্রে বর্ণিত রয়েছে, গৌতম বুদ্ধ তার বোধি লাভের সময়ে চতুরার্যসত্যের দর্শন করেন। এই চতুরার্যসত্য হল - জগত দুঃখময়, সেই দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব এবং দুঃখ নিবৃত্তির উপায় আছে। এইভাবে অনুশীলনের দ্বারা তিনি ঈশ্বর, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের মধ্যে দিয়ে বোধিলাভ করেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছে এবং এটাই তাঁর শেষ জীবন তিনি আর পুনর্জন্ম লাভ করবেন না।

পূর্বে উল্লেখিত চতুরার্যসত্য- জগতে দুঃখ থাকায় সেই দুঃখের কারণ হল- অবিদ্যা এবং কামনা-বাসনা। অতএব, বোধিলাভের অর্থ হল সেই অবিদ্যা ও কামনা-বাসনার চিরতরে অবলুপ্তি এবং এক দেহ থেকে অন্য দেহ ধারণের সমাপ্তি (পুনর্জন্মের বিনাশ)। নির্বাণ পদটি বৌদ্ধদর্শনে এটি আদর্শ, যার অর্থ হল মুক্তিলাভ বা নিরোধ। নির্বাণ হল অসংস্কৃত ধর্ম, যা লাভ করা যায় কামনা-বাসনা নিরোধের মধ্য দিয়ে। নির্বাণ লাভের পন্থারূপে চারটি মার্গচিত্ত পরিগণিত হয়। প্রথমটি হল, স্রোতাপত্তি মার্গচিত্ত যা উপলব্ধির প্রথম স্তর। স্রোতাপত্তি বলতে বোঝায় নির্বাণমুখী স্রোতে অনুপ্রবেশ। দ্বিতীয় স্তর হল সকৃদাগামী মার্গচিত্ত। স্রোতাপন্ন ব্যক্তি ধ্যানের গভীরে মগ্ন হয়ে নির্বণোপলব্ধির দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হন। সকৃদাগামী শব্দের অর্থ একবারমাত্র আগমনকারী অর্থাৎ এই স্তরের ব্যক্তিকে একবারের বেশি পুর্নজন্ম গ্রহণ করতে হয় না। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা বারংবার অনুশীলনের দ্বারা নির্বাণ উপলব্ধির তৃতীয় স্তর অনাগামী মার্গচিত্তে ব্যক্তি উপনিত হলে কামনাবাসনার বন্ধন নিঃশেষ হয়। এই স্তরে অনাগামী ব্যক্তিকে জন্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কামলোকে আগমন করতে হয় না। এই অনুশীলনের চরম সীমায় উপনীত হলে নির্বাণ

উপলব্ধির চতুর্থ স্তর অর্হত্ব মার্গচিত্তে মনের সকল রিপু বা অকুশল চিন্তাভাবনার অবসান হয়। এই স্তরেই জীবনের পূর্ণ পরিণতি ঘটে।[১]

হীনযান বৌদ্ধধর্মে নিরোধের এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ার অবসান ঘটে মহাযান দর্শনের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। এই দর্শনে নির্বাণকে অস্বীকার করা হয়নি। যদিও বোধিসত্ত্ব নিজে নির্বাণের স্তরের অধিকারী হলেও তিনি নিজে নির্বাণ গ্রহণ না করে সংসারের এই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ থাকতে চান। এর দুটি কারণ হয়েছে। প্রথমতঃ, বোধিসত্ত্বের কাছে তার নিজস্ব মুক্তি কাম্য নয়। সকলের মুক্তির মধ্য দিয়ে তথা সকলের দুঃখকষ্ট বিনাশের মধ্যে দিয়ে তাঁর নিজস্ব মুক্তি সম্পূর্ণতা পায়। সে অপরের দুঃখকষ্ট দেখে এবং অপরের দুঃখকষ্টকে নিজের দুঃখকষ্টরূপে বিবেচনা করে অপরের মুক্তিলাভকেই নিজের মুক্তিলাভের পথ বলে মনে করেন। বোধিসত্ত্ব সকল স্থান, কাল, পরিস্থিতি নির্বিশেষে সকলের উপকার করতে এগিয়ে যান এবং নিজের করুণা ও উপায়ের মধ্য দিয়ে সকলের মোক্ষ লাভের পথ প্রশস্ত করেন।

বোধিসত্ত্বের করুণা ও উপায়ের অনুশীলনের মাধ্যমে নির্বাণের অস্থায়িত্বের যে উপলব্ধি তা প্রজ্ঞার মধ্য দিয়েই প্রস্ফুটিত হয়। হীনযান অভিধর্ম দর্শনে সংসার এবং নির্বাণ মৌলিকভাবে পৃথক এবং তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু মহাযান দার্শনিকগণ সংসার ও নির্বাণের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেন। ফলতঃ সাংসারিক বন্ধনের নিরোধের মধ্যে দিয়ে নির্বাণ ঘটে না। অর্থাৎ যদি কেউ সংসারকে শূন্য এবং ভ্রমরূপে উপলব্ধি করে তাহলে তিনি সংসার অবস্থাতেই নির্বাণে উপনীত হয়। নির্বাণ সংসারের মধ্যস্থলেই অবস্থিত, তার জন্য পৃথক কোনো স্থান, কালের প্রয়োজন নেই।

১। ব্রহ্মচারী শীলানন্দ , *অভিধর্ম-দর্পণ* , উত্তর ২৪ পরগণা , মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাস্টি বোর্ড , ১৩৯৮ , পৃষ্ঠা - ৭৪-৭৬।

সংসারকে নির্বাণরূপে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে অপর একটি ধারণা ফুটে ওঠে তা হল ক্লেশকে বোধিরূপে পরিগণিত করা। অভিধর্ম দর্শন অনুযায়ী, কামনা, রাগ, অবিদ্যা এবং অন্যান্য ক্লেশগুলি যাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা থেকে মানুষের মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয় - মহাযান দর্শনে বিষয়টিকে অস্বীকার করা হয়েছে। যারা অজ্ঞ, বোধিলাভে অসমর্থ তাদের কাছে ভালবাসা বন্ধন বলে মনে হলেও বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের নিকট তা হল করুণা, যা সকল মানুষের উদ্ধারের জন্য অপরিহার্য। যদি কেউ কামনা-বাসনাকে শুধুমাত্র কামনাবাসনারূপে গ্রহণ না করে সেটিকে অপরের মঙ্গলার্থে উপায়রূপে ব্যবহার করতে পারেন তাদের কাছে কামনাবাসনা আর বন্ধনের হেতু হয় না।

হীনযান বৌদ্ধদর্শনে সংসারের নৈতিক ভিত্তিরূপে একজন মানুষের কর্মতত্ত্বকে স্বীকার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে মানুষের কৃতকর্মের ফল তার কাছেই সর্বদা ফিরে আসে। কিন্তু মহাযান দর্শনের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে তাদের পরিণমনা তত্ত্বের মধ্য দিয়ে এর ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নিজের কামনাবাসনার পূর্ণতাপ্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে যে সুখতার তুলনায় সুকর্মের মধ্যে দিয়ে যে সুখ পাওয়া যায় তা অধিক পূর্ণতার দাবি রাখে। এই পূর্ণতার দুটি স্তর হতে পারে। প্রথমতঃ, নিজের সুকর্মের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব বোধিলাভ যা নির্বাণের পথ প্রশস্ত করে। দ্বিতীয়তঃ, নিজের সুকর্মের মধ্য দিয়ে নিজের বোধিলাভের চিন্তা না করে অপরের বোধিলাভ বা সুখলাভের চিন্তা করা। মহাযানের মূল উদ্দেশ্য হল অপরের জন্য বোধিসত্ত্বের কর্ম সম্পাদন।

সর্বোচ্চ সুখ হল বোধিপ্রাপ্তি এবং সর্বজ্ঞতালাভ। কারণ বোধিলাভ নিজ এবং অপর উভয়ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষতার দাবি রাখে। তাই নিজের সুকর্মের মধ্যে দিয়ে নিজের সর্বজ্ঞতা প্রতিষ্ঠিত হলে সে অপরের জন্যও সুকর্ম করতে উদ্যোগী হওয়ায় সম্ভাবনা রাখে। *অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞা-পারমিতা-সূত্রে* সর্বজ্ঞতা লাভের উপাররূপে ছয়টি পারমিতার উল্লেখ করা হয়েছে। বোধিসত্ত্বের ছয়টি গুণাবলীর অনুশীলন যথা - দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা এগুলিকেই পারমিতা বলা হয়। এগুলির মাধ্যমে শুধুমাত্র নৈতিকতাই প্রকাশ পায় না, এগুলে বোধিলাভ ও

সর্বজ্ঞতা প্রদানেও সক্ষম। প্রথম পাঁচটি পারমিতা যখন ষষ্ঠ পারমিতা অর্থাৎ প্রজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখনই তা পারমিতারূপে গণ্য হয়। অতএব, প্রজ্ঞালাভের পূর্ণতার মধ্য দিয়েই বোধিলাভের পূর্ণতাপ্রাপ্তি। এই কারণেই প্রজ্ঞার উপর বৌদ্ধ দার্শনিকরা সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

-: গ্রন্থপঞ্জী :-

মূল গ্রন্থ :

- প্রজ্ঞাকরমতিকৃত *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা* , কলিকাতা , এশিয়াটিক সোস্যাইটি প্রকাশিত , ১৯১২ ।

সহায়ক গ্রন্থ :

- চৌধুরী সুকোমল সম্পাদিত , *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন* , কলিকাতা , মহাবোধি বুক এজেন্সী , ১৯৯৭ ।

- জ্যোতি পাল স্থবির অনুদিত , *বোধিচর্যাবতার* , ঢাকা , বাংলা একাডেমী প্রকাশিত , ১৯৭৭ ।

- ভট্টাচার্য অনন্ত কুমার , *বৈভাষিক দর্শন* , কলিকাতা , ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি , ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

- ব্রহ্মচারী শীলানন্দ , *অভিধর্ম-দর্পণ* , উত্তর ২৪ পরগণা , মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাস্টি বোর্ড , ১৩৯৮ , পৃষ্ঠা - ৭৪-৭৬।

- শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য ও শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাস্থবির সম্পাদিত ও অনুবাদিত , *বোধিচর্যাবতার* , কলিকাতা , মহাবোধি বুক এজেন্সি , ২০০৫ ।

- Brassard Francis , *The Concept of Bodhicitta in Sāntidevas Bodhicaryāvatāra* , New York ,State University of New York Press , 1961 .

- Conze Edward , *Buddhist Thought in India ,* New Delhi , Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. , 1996 .

- Conze Edward , "The Ontology of the Prajñāpāramitā" , *Philosophy East and West* , Vol. 3 , No. 2 (Jul. 1953) , pp. 117-129 , University of Hawai'i Press, <http://www.jstor.org/stable/1397258><accessed 2nd August 2018>

- Dalai Lama , *A Policy of Kindness* – An anthology Writings By and About the Dalai Lama , Delhi , Motilal Banarsidass Publishers Private Limited , 2000.

- Dr. P.L. Vaidya (Edited) , *Aṣṭasāhasrikā Pragñāpāramitā* , Darbhanga , The Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning , 1961.

- Har Dayal , *The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature* , Delhi , Motilal Banarsidass Publishers Private Limited , 1932 .

- Harvey Peter , *An Introduction to Buddhist Ethics* , Cambridge , Cambridge University Press ,1999.

- Kajiyama Y. , *Studies in Buddhist Philosophy* , Edt. by Katsumi Mimaki , Kyoto , Rinsen Book Co. Ltd. , 2005 .

- Kate Crosby and Andrew Skilton (Translated) , *Santideva The Bodhicaryāvatāra* , New York , Oxford University Press , 1995.

- Luis O. Gómez , "Emptiness and Moral Perfection" , *Philosophy East and West* , Vol. 23, No. 3 , Philosophy and Revolution (Jul., 1973) , pp. 361-373 , University of Hawai'I Press , <http://www.jstor.org/stable/1398335><accessed 2nd August 2018>

- Malalasekera G.P. (Edt.) , *Encyclopedia of Buddhism* (Vol – VII) , Published by The Government of Sri Lanka , 2005 .

- Mitra R. (edt.) , *Asta – sahasrika Prajna – Paramita* , Calcutta , Bibliotheca Indica , 1888.

- Morion L. Matics (Translated) ,*Entering the Path of Enligthenment*, London , George Allen & Unwin Ltd. , 1971 .

- Nariman J. K. , *Literary History of Sanskrit Buddhism*, Delhi, Motilal Banarsidass Pulishers Private Limited, 1992.

- N.K. Singh A.P. Mishra (Edited) , *Encyclopedia of Oriental Philosophy and Religion* : Buddhism (Vol. – 10) , New Delhi , Global Vision Publishing house , 2007 .

- Ray Reginald, *Buddhist Saints in India* : A Study in Buddhist Values & Orientations, Oxford University Press ,1994.

- Robert E. Buswell (Edt.) , *Encyclopedia of Buddism* , New York : McMillan USA , 2004 .

- Santideva , *Siksa – samuccaya*, Translated by Cecil Bendall and W.H.D. Rouse, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited , 1999.

- Santideva , *Śiksāsamuccaya* , Edited by Dr. P.L. Vaidya , Darbhanga , The Mithila Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning , 1961.

- Vidyabhusans S.C. , *A History of Indian Logic*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1970.

WORLD PHILOSOPHY DAY 2018

Organized by

Department of Philosophy, Jadavpur University

This is to certify that Smt. Riyanka Dutta *participated in the one day state level seminar, titled* **PHILOSOPHY: THEN AND NOW** *held on the occasion of World Philosophy Day on 21st December 2018 at Department of Philosophy, Jadavpur University and presented a paper on* পারমিতা হিসাবে শূন্যতার স্বরূপ অনুসন্ধান.

Prof. Proyash Sarkar 21/12/18 — *Head*

Dr. Preetam Ghoshal — *Dr. Gargi Goswami* — *Coordinators*

পারমিতা হিসাবে প্রজ্ঞার স্বরূপ অন্বেষণ

রিয়াঙ্কা দত্ত

বৌদ্ধ দর্শন সম্প্রদায়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল মহাযান সম্প্রদায়। মহাযানের মূল বক্তব্য হল নিজের ব্যক্তিগত মুক্তির কথা চিন্তা না করে সকলের মুক্তি লাভের চেষ্টা করা। যিনি সকলের মুক্তি কামনা করেন, তাকে পারিভাষিক ভাষায় বোধিসত্ত্ব বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এই বোধিসত্ত্ব তিনিই যার বুদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা আছে এবং যিনি পরের মুক্তি না ঘটিয়ে নিজের মুক্তির কামনা করে না। এই বোধিসত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য ব্যক্তির জীবনশৈলী কেমন হবে এবং তার মধ্যে কোন্ কোন্ গুণ কীভাবে বিকশিত হবে - এই নিয়ে বিভিন্ন মহাযান গ্রন্থে নানা রকম আলোচনা করা হয়েছে। তবে সকলেই এই বিষয়ে এক মত যে, বোধিসত্ত্বের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার জন্য ব্যক্তির মধ্যে প্রজ্ঞার অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। এই প্রজ্ঞা বৌদ্ধমতে একটি পারমিতা। এছাড়াও আরও অন্যান্য পারমিতার উল্লেখ পাওয়া যায় এই মহাযান গ্রন্থগুলিতে। সমস্ত পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞাকেই শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা হয়েছে। আমি আমার এই প্রবন্ধে শান্তিদেব রচিত *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থ অবলম্বন করে প্রজ্ঞা পারমিতার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে চাই। দেখাতে চাই কী অর্থে বা কেন প্রজ্ঞা পারমিতাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

বোধিসত্ত্বগণকে বোধিচর্যার দ্বারা বুদ্ধত্ব লাভ করতে হলে তাঁকে উপায়স্বরূপ পারমিতার অনুশীলন করতে হবে। বৌদ্ধশাস্ত্রে মানবতার পূর্ণ বিকাশের জন্য অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য বিশিষ্ট সাধন প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে - তার নাম পারমিতা সাধনা। 'পারমিতা' শব্দের অর্থ যাহা পারে গিয়াছে অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়েছে। সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত 'পারমিতা' শব্দটি পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে 'পারমী' নামে কথিত হয়। উক্ত হয়েছে - গৌতম বুদ্ধ তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মে দশবিধ সদ্‌গুণের বিকাশ সাধন করতে করতে গৌতম সিদ্ধার্থ জন্মে 'দশ পারমিতা' পূর্ণ করে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রের দশ পারমিতা (পারমী) যথা - ১) দান, ২) শীল, ৩) ক্ষান্তি, ৪) বীর্য, ৫) ধ্যান, ৬) প্রজ্ঞা, ৭) সত্য, ৮) অধিষ্ঠান, ৯) মৈত্রী ও ১০) উপেক্ষা। জাতক গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, বোধিসত্ত্ব গৌতম ৫৫০ জন্মের মধ্যে দিয়ে দশ পারমিতা পূর্ণ করে সম্যক

সম্বোধি রূপ লোকোত্তর সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[১] মহাযানী সাধকরা বোধিচিত্ত গ্রহণের পর প্রথম ছয়টি পারমিতা সাধনাকে আবশ্যক চর্যারূপে অবলম্বন করে থাকেন।

উপরোক্ত দশটি পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞারূপ পারমিতা শ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দানাদি পারমিতা অনুশীলন করেছেন কিন্তু প্রজ্ঞার অনুশীলন করেননি তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারবেন না। অর্থাৎ দানাদি পারমিতা অনুশীলন করা সত্ত্বেও তা যদি প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত না হয় তাহলে ব্যক্তির যে চরম লক্ষ্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, তা সম্ভব নয়। কারণ দান, শীল ইত্যাদির দ্বারা ব্যক্তির চরিত্র গঠন হয়ে মন থেকে সমস্ত কলুষতা দূর হয় ঠিকই কিন্তু তার দ্বারা বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হয় না। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য সেই শুদ্ধ মনে বস্তুর যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, এবং সেই জ্ঞান যা আসে প্রজ্ঞা থেকে। তাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য বা সাংসারিক দুঃখ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে বুদ্ধত্ব লাভ করতে হলে প্রজ্ঞা উৎপাদনের প্রতি যত্ন নেওয়া উচিত।[২]

এই প্রসঙ্গে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে ,

ইমং পরিকরং সর্বং প্রজ্ঞার্থং হি মুনির্জগৌ ।
তস্মাদুৎপাদয়েৎ প্রজ্ঞাং দুঃখনিবৃত্তিকাঙ্ক্ষয়া ।।১।।[৩]

অর্থাৎ, মুনি বুদ্ধদেব বলেছেন - এইসব পরিকর বা সাধন সমূহ শুধু প্রজ্ঞালাভের জন্যই। অতএব, দুঃখনিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রজ্ঞার উৎপাদন অবশ্য কর্তব্য।

'ইমং' শব্দের অর্থ এই, পরিকর অর্থাৎ এই সমস্ত দানাদি পারমিতা সাধন সবকিছুই প্রজ্ঞার নিমিত্ত। এই প্রজ্ঞা কিন্তু প্রমাণ নয়, তা হল বুদ্ধত্ব লাভের উপায়। প্রজ্ঞা হল চরম জ্ঞান বা ultimate knowledge যার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব অর্জন করা যায়।

১।বোধিচর্যাবতার , জ্যোতি পাল স্থবির অনূদিত, পৃষ্ঠা - ২৩

২।প্রজ্ঞাকরমতিকৃত বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা, পৃষ্ঠা - ৩৪৪

৩।তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪৪

এখন প্রশ্ন হবে, কার প্রজ্ঞার উৎপাদন করা উচিত? ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, যিনি দুঃখের নিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করেন অর্থাৎ যিনি সংসারের সমস্ত দুঃখ থেকে নিবৃত্তি পেতে চান তাকে দানাদি পারমিতা অনুশীলনের সাথে সাথে প্রজ্ঞার প্রতিও যত্নবান হতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন ,প্রজ্ঞা কী? - প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে গিয়ে টীকাকার প্রজ্ঞাকরমতি তাঁর *বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা* টীকায় বলেছেন, 'প্রজ্ঞা যথাবস্থিতপ্রতীত্যসমুৎপন্নবস্তুতত্ত্বপ্রবিচয়লক্ষণা'[৪] অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপন্ন হিসাবে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কের জ্ঞানই হল প্রজ্ঞা। প্রতীত্যসমুৎপন্ন বলতে বোঝায়, জগতের সমস্ত বস্তুই অন্য এক বস্তু থেকে উৎপন্ন, অর্থাৎ কোন বস্তুই নিরপেক্ষ নয় - অপরের সাপেক্ষেই বস্তুর সত্তা। বস্তুর এই যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কের জ্ঞানই হল প্রজ্ঞা। *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'দানপারমিতাদিষু ধর্মপ্রবিচয়স্বভাবায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ প্রধানত্বাৎ'[৫] অর্থাৎ সমস্ত পারমিতার মধ্যে প্রজ্ঞা হল প্রধান। প্রজ্ঞা হল ধর্মের স্বরূপ।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে প্রজ্ঞাই যদি প্রধান হয় তাহলে অন্য পারমিতা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে প্রথম পাঁচটি পারমিতার স্বরূপ জানা প্রয়োজন। প্রথমেই আসে দান পারমিতা। দান হল বোধিচর্যার উদ্দেশ্যে প্রথম ধাপ। দান-এর আক্ষরিক অর্থ হল দেওয়া,সমার্থক শব্দ হল উদারতা, দানশীলতা। ত্যাগের অনুশীলন করা হল দানেরই সমার্থক।[৬] দানের অনুশীলন দ্বারা ব্যক্তির স্বার্থবুদ্ধি দূর হয় এবং আত্মপ্রসার সাধিত হয়। তাই সর্ব জীবের নিমিত্ত সকল বস্তু দান বা ত্যাগ করা উচিত এবং তার সাথে দানফলও পরিত্যাগ করতে হবে - তাই হল দান পারমিতা সাধনা। সাধারণভাবে মনে হয় দান একটি বাহ্য আচরণ, তার সাথে চিত্তের কোনো যোগ নেই।কিন্তু শান্তিদেব মনে করেন, দান পারমিতাও চিত্ত প্রধান। কেবল অত্যধিক বাহ্যদানে দান পারমিতা সাধনা সম্পাদিত হয় না। সকল কাম্যবস্তু সর্বজনের জন্য ত্যাগ করার বোধ চিত্তে উৎপন্ন করতে হবে। এইরূপে ক্রমাগত দানের অভ্যাসের দ্বারা যে মাৎসর্যবিহীন,নির্মল,নিরাসক্ত চিত্ত উৎপন্ন হবে, তাই দান পারমিতা নামে খ্যাত।

৪।তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪৪

৫।তদেব, পৃষ্ঠা - ৩৪৪

৬।Har Dayal, *The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1932.pg -166

দান পারমিতার পরেই আসে শীল পারমিতা। শীল শব্দের অর্থ হল পুনঃ পুনঃ যা আচরণ করা হয়। শীলোক্ত অনুশাসনগুলি পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। প্রাণী হিংসা থেকে বিরতি, পরস্বাপহরণ থেকে বিরতি, ব্যভিচার থেকে বিরতি, মিথ্যাকথন থেকে বিরতি এবং মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরতি - বৌদ্ধশাস্ত্রে এইগুলি পঞ্চশীল নামে খ্যাত। এই পাঁচটি পাপকর্ম হল সংসারের যাবতীয় দন্দ্ব, সংঘর্ষের মূল কারণ। এই কারণে মানবতার অগ্রগতির জন্য কার্যকরী পন্থারূপে বুদ্ধদেব নির্দেশে দিয়েছেন যে, এই 'পঞ্চশীল' প্রত্যেকেরই অনুষ্ঠেয় প্রাথমিক কর্তব্য। আচার্য শান্তিদেবের মতে, চিত্ত থেকে সমস্ত পাপকর্ম ও পুণ্যকর্মের উদ্ভব হয়ে থাকে। তাই হিংসা, চৌর্য, ব্যভিচারাদি বাহ্যকর্ম থেকে বিরত হয়েও লোক এই সমস্ত পাপকর্মের প্রতি অনুরাগ পোষণ করতে পারে। এই অবস্থায় শীল সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং, শীল পরিশুদ্ধির জন্য 'চিত্ত পরিকর্ম' বা চিত্ত শোধন একান্ত আবশ্যক। তাই শীল পারমিতা সাধনার জন্য চিত্তকে সুসংযত করতে হয়। কাম, ক্রোধ, মোহ থেকে চিত্তকে সুরক্ষিত করতে হবে। বস্তুতপক্ষে, সর্বজীবের সতত হিত সুখ সাধন- তাই সর্বশ্রেষ্ঠ শীল।

এরপরে আসে ক্ষান্তি পারমিতা। ক্ষান্তি শব্দের সমার্থক শব্দ হল ক্ষমা, ধৈর্য্য, নম্রতা ইত্যাদি। এর বিপরীত শব্দ হল ক্রোধ, অপমান। ক্ষান্তি হল রাগ ও আবেগের থেকে মুক্তি। এটি আঘাত ও অপমানের মার্জনাকারী অনুশীলন। এটাই হল ক্ষমার প্রাথমিক এবং মৌলিক সংজ্ঞা।[৭] মানবতার সাধককে সর্ব প্রযত্নে ক্ষান্তি বা ক্ষমাশীলতার অনুশীলন করতে হবে। অপরে যতই দুর্ব্যবহার করুক না কেন তার প্রতিহিংসা গ্রহণে বিরত থাকতে হবে। এমনকি তার বিরুদ্ধে কোনো অসদিচ্ছা বা প্রতিহিংসার ভাব পোষণ করা যাবে না। আচার্য শান্তিদেব তাঁর *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ক্ষান্তি পারমিতার সাধন প্রণালী বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তারঁ মতে, দ্বেষের সমান পাপ নেই এবং ক্ষমার সমান তপস্যা নেই। অতএব, পরম যত্নে ক্ষমার অনুশীলন করা উচিত।

৭। Har Dayal, *The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1932.pg -209

এর পরে আসে বীর্য পারমিতা। পারমিতা হিসাবে 'বীর্য' শব্দটি একটি ব্যাপক বিস্তারসম্পন্ন শব্দ। 'বীর্য' শব্দটি এসেছে বীর থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ হল তেজ, ক্ষমতা, সাহস ইত্যাদি অবস্থাসম্পন্ন এক শক্তিশালী ব্যক্তি।[৮] কুশল কর্মে উৎসাহই 'বীর্য' নামে খ্যাত। এই প্রসঙ্গে *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে বলা হয়েছে - ক্ষমাশীল হয়ে বীর্যের আশ্রয় নিতে হবে, কেননা বীর্যেই বোধি অবস্থান করছে। বায়ু বিনা যেমন গতি অসম্ভব তেমনি বীর্য বিনা পুণ্যও সম্ভব নয়।[৯]

এর পরেই আসে ধ্যান পারমিতা। বীর্য পারমিতার সাধনার দ্বারা পূর্ণ মানবতা লাভে উৎসাহ বর্ধিত করে সাধককে ধ্যান পারমিতার সাধনায় অগ্রসর হতে হবে। বিক্ষিপ্তচিত্ত মানুষ কখনো কাম-ক্রোধাদি ক্লেশসমূহকে প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয় না। এজন্য ভগবান তথাগত দুটি সাধনার উপদেশ দিয়েছিলেন- ১)শমথ বা সমাধি অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা এবং ২)বিপশ্যনা অর্থাৎ সমাধিজ প্রজ্ঞা। ধ্যান পারমিতার সাধককে সংসারের ভোগ সুখ যে কত তুচ্ছ, ক্ষুদ্র তা বিচার করতে হবে। এই ভোগ সুখের জন্য প্রাণীগণ জন্ম-জন্মান্তর ধরে যে পরিমাণ পরিশ্রম করে এবং দুঃখ সহ্য করে তার তুলনায় অল্প পরিশ্রম ও অল্প দুঃখ সহ্য করে তারা বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারে। এইভাবে বিচার করে বৈরাগ্য উৎপন্ন হলে সাধক নির্জন স্থানে গমনপূর্বক ধ্যান সাধনায় প্রবৃত্ত হবেন। আচার্য শান্তিদেব তাঁর *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদে ধ্যান পারমিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এরপরেই আসে প্রজ্ঞা পারমিতা। এইভাবে দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য ও ধ্যানের অনুশীলনের মাধ্যমে বোধিসত্ত্ব প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত হতে পারেন। দান, শীল, ক্ষান্তি- এই তিনটি সঠিকভাবে অনুশীলন করলে পুণ্য লাভ হয়। কিন্তু বোধি লাভ করতে হলে পুণ্যসম্ভারের পাশাপাশি জ্ঞানসম্ভারও প্রয়োজন, যে জ্ঞান আসে ধ্যান ও বীর্য থেকে। এই পুণ্যসম্ভার ও জ্ঞানসম্ভার উভয়েই কারণস্বরূপ চিত্তের সমস্ত কলুষতা দূর করে চিত্তকে সমাহিত করে। চিত্ত যখন কলুষতা মুক্ত হয় তখন তা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ক চিন্তার উপযোগী হয়। তাই অষ্টাঙ্গিক মার্গেও শীলের পরে

৮। Har Dayal, *The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature*, Delhi, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1932.pg -216

৯। বোধিচর্যাবতার , জ্যোতি পাল স্থবির অনূদিত, পৃষ্ঠা - ৩২

আসে সমাধি তারপরে আসে প্রজ্ঞা। অতএব, এই পাঁচটি পারমিতার সাহায্যে ব্যক্তি প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত হতে পারবে।

প্রজ্ঞাকে বাদ দিয়ে এই পাঁচটি পারমিতার অনুশীলন বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির হেতু হতে পারে না। এমনকী এই পাঁচটি গুণকে পারমিতা নামে অভিহিত করতে পারব না যদি না তা প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত হয়। অর্থাৎ প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত হলে তবেই তা পরিশুদ্ধ হবে। তবেই আমরা নির্বাণ অবস্থা, যেখানে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হয়, সেই অনুকূল অবস্থায় উপনীত হতে পারব। তখনই তা পারমিতা নামের যোগ্য হবে। অবিদ্যাবশতঃ আমাদের যে মিথ্যাজ্ঞান বা বিকল্প জ্ঞান আছে, সেই ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ তখনই দূর হয় এবং উভয়প্রকার নৈরাত্ম্য অর্থাৎ পুদ্গল নৈরাত্ম্য ও স্বভাব নৈরাত্ম্য বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান দূর হয়ে মন বস্তুর যে প্রকৃত স্বভাব তা গ্রহণে উপযুক্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যক্তি যেমন চন্দ্রমন্ডল, সূর্যমন্ডল ছাড়া কাজ করতে পারে না, তেমনি দান, শীল ইত্যাদি পঞ্চ পারমিতা আছে বলেই প্রজ্ঞা অর্জন করতে পারি। একইভাবে প্রজ্ঞা পারমিতা ছাড়া পঞ্চপারমিতা পারমিতা নামে পরিচিত হতেও পারবে না। যেমন, রাজা রাজ চক্রবর্তীর যতই সৈন্য, ঐশ্বর্য থাকুক না কেন যদি তিনি সঠিকভাবে রাজ্য পরিচালনা না করতেন তাহলে কেউ তাকে রাজ চক্রবর্তী বলে মনে রাখত না। কারণ- ইতিহাসে অনেক রাজাই এসেছেন, কিন্তু তাকে মনে রাখা হয়েছে তার কাজের জন্যই। সেইরকম দান, শীল ইত্যাদি পারমিতারও মূল্য আছে যখন তারা প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত হয় বা প্রজ্ঞা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঠিক যেমন গঙ্গা হল বড় নদী, অন্যান্য ছোটো ছোটো উপনদী তার সাথে এসে মিশে তবেই তারা সাগরে পতিত হতে পারে। যদি গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত না হতো তাহলে তারা সাগরে মিশতে পারত না। দান ইত্যাদি পারমিতা প্রজ্ঞার সাথে সংযুক্ত হয়েই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, অর্থাৎ পঞ্চ পারমিতার কথা বলা হলেও সেই পারমিতাগুলি তখনই সার্থক হয় যখন তারা প্রজ্ঞার সাথে যুক্ত হয়। এখানেই অন্যান্য পারমিতার তুলনায় প্রজ্ঞার পার্থক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব উভয়ই।

এই প্রজ্ঞা দুই প্রকার - হেতুভূত ও ফলভূত। হেতুভূত প্রজ্ঞাও দুই প্রকার- অধিমুক্তিচরিত এবং ভূমিপ্রবিষ্ট চরিত। প্রজ্ঞার স্তরের যে ভেদ তার কারণ হল বোধিসত্ত্বের জীবনের অগ্রগতি। বোধিসত্ত্বের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অনুযায়ী প্রজ্ঞাকে এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় - যিনি সবেমাত্র বোধিসত্ত্বের জীবনের প্রথম পর্যায় বা ভূমিতে প্রবেশ করেছেন তার প্রজ্ঞা, অন্যটি হল, যিনি বোধিসত্ত্বের জীবনের অনেকটা পর্যায় অগ্রসর হয়ে ফেলেছেন সেই ব্যক্তির প্রজ্ঞা। অর্থাৎ, বোধিসত্ত্বের জীবনের পর্যায় অনুযায়ী প্রজ্ঞার স্তর নির্ধারিত হয়। যেহেতু প্রজ্ঞার এই ভেদ হেতু থেকে সৃষ্ট তাই তা হেতুভূত। অপরদিকে, ফলভূত প্রজ্ঞা হল যা কোনো ফল থেকে উৎপন্ন নয়। প্রজ্ঞার এই স্তরে ব্যক্তি সমস্ত প্রকার মঙ্গল সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবে এবং তা থেকে সর্বধর্মশূণ্যতারূপ স্বভাবের বোধ উৎপন্ন হবে। বোধিসত্ত্ব তার জীবনে শ্রুত, চিন্তা ও ভাবনা - এই ক্রম অনুযায়ী অভ্যাস করার ফলে তার মধ্যে ভূমিপ্রবিষ্ট প্রজ্ঞা উৎপন্ন হবে। অর্থাৎ বোধিসত্ত্বের জীবনের ভূমিতে প্রবেশ করার হেতু হল এই শ্রুত, চিন্তা ও ভাবনার ক্রমিক অভ্যাস। ভূমিপ্রবিষ্ট প্রজ্ঞার দ্বারা বোধিসত্ত্ব এক-একটি ভূমি অতিক্রম করার ফলে বোধিসত্ত্বের জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ঘটবে যার ফলে উভয় প্রকার আবরণ দূর হয়ে যাবে, সকল প্রকার জাতি, কল্পনাজাল মুক্ত হয়ে যাবে। যিনি বুদ্ধ তিনি এই সবকিছুর উর্ধ্বে। প্রজ্ঞার দ্বারা ভূমিপ্রবিষ্ট হলে এই সকল প্রকার আবরণ দূরে সরে গিয়ে মূলতত্ত্ব বা বোধিচিত্ত (বুদ্ধস্বভাব) ফুটে উঠবে। তখন সর্বোচ্চ স্তর অধিমুক্তির স্তরে পৌঁছতে পারা সম্ভব হবে। দুঃখনিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষাবশতঃ এই প্রজ্ঞা প্রয়োজন। প্রজ্ঞার উৎপন্ন হলে বিকল্পজ্ঞান থেকে সৃষ্ট মিথ্যাদৃষ্টির অবসান হবে। ফলে বোধিচিত্তের উৎপত্তি হবে। তখনই দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব হবে।

সংসারে আবদ্ধ ব্যক্তি এবং যাদের আত্মার প্রতি অভিমান আছে তারাই দুঃখ পায়। দুঃখ হল জাতি, ব্যধি, জরামরণস্বভাববিশিষ্ট, প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয়সংযোগ ইত্যাদির পর্যায়ক্রম। সংক্ষেপে বলা যায় দুঃখ হল পঞ্চস্কন্ধ বা উপাদান (রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার) দ্বারা উৎপন্ন ব্যক্তি বা পুদ্গল। নিবৃত্তির অর্থ হল নির্বাণ বা উপশম। উপশমের অর্থ হল পুনরায় যাতে

সেই ধর্ম উৎপন্ন হতে না পারে, তার আত্যন্তিক সমুচ্ছেদ। সেই চেষ্টারই আকাঙ্ক্ষা বা অভিলাষ হল দুঃখনিবৃত্তি।

প্রজ্ঞার দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি ঘটবে। অবিদ্যার ফলে আমরা যা কিছু অভিজ্ঞতায় পাই সবই সংস্কৃত বস্তু এবং তারা সবই স্বপ্নমায়াদিস্বভাববিশিষ্ট। তাকেই সাধারণ মানুষ আসল বলে মনে করে। বোধিচিত্তের বোধ উৎপন্ন হলে তখনই মানুষ বুঝতে পারবে যে তা স্বপ্নমায়াস্বভাব। স্বপ্ন ছাড়া যেমন স্বপ্নের বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই, তেমনি এই জগত ছাড়া বস্তুগুলিরও কোনো অস্তিত্ব নেই। ফলে সমস্ত ধর্মের নিঃস্বভাবতার প্রতিপত্তি ঘটবে। যখন ব্যক্তি বুঝবে যে সমস্ত বস্তুই নিঃস্বভাব তখন তার প্রতি আকাঙ্ক্ষা চলে যাবে। ফলে সমস্ত দুঃখেরও উপশম হবে। এইভাবে শান্তিদেব রচিত *বোধিচর্যাবতার* গ্রন্থে যুক্তি ও আগমের দ্বারা সমস্ত দুঃখের উপশম হেতু প্রজ্ঞার নির্দেশ করা হয়েছে।